ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ।। ২০ পৌষ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ৫ জানুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

হিন্দুত্ব বিরোধী কাজ করলে ভোট নয় ঃ শ্রীসুদর্শন

মালদায় সমাবেশে ভাষণরত শ্রীসুদর্শন। তাঁর ডানদিকে সত্যনারায়ণ মজুমদার ও বাঁদিকে হেমন্ত কুমার বর্মা।

বাসুদেব পাল।। "ভারতের ভাগ্যসূর্য ২০১১ সালে স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে, আর ২০২০ সালে ভারতমাতা জগজ্জননীরূপে প্রতিভাত হবেন। এখন আমরা যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলেছি। তবে এই যুগপরিবর্তনের মাধ্যম হল মানুষ। মানুষের মাধ্যমেই যুগপরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর সেই মানুষ আপনারা, আমরা। আমরা সক্রিয় না হলে পরিবর্তন হবে না। রামের ছিল বানর সেনা, তবুও রামচন্দ্র প্রবল পরাক্রান্ত রাবণ ও তার রাক্ষস সৈন্যদলকে পরাজিত করে ধর্মস্থাপন করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে পান্ডবদের সৈন্যসংখ্যা কৌরবদের তুলনায় কম ছিল, তবুও তাঁরা আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করেছেন।" গত ২৪ ডিসেম্বর মালদহের রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন ডি এস এ মায়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কর্তৃক আয়োজিত এক বিশাল স্বয়ংসেবক ও নাগরিক সমাবেশে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজী।

তিনি আরও বলেন, বিগত ৮৩ বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দু সমাজকে কুরীতি (রুঢ়ি) মুক্ত করে সংগঠিত করার কাজ করে আসছে। এখন তার পরিণাম কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী ১৯২৫ সালে যখন সঙ্ঘ শুরু করেছিলেন তখন হিন্দুরা নিজেদের হিন্দু বলতে চাইত না।

(এরপর ৪ পাতায়)

কাশ্মীরে নির্বাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়

মিডিয়ার একাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে

গুপ্তপুরুষ ।। জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে একটা কথা স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে পাক জঙ্গি আক্রমণের শিকার এই রাজ্যের মুসলিম ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাকিস্তানের পরিবর্তে হিন্দুস্তানকেই চায়। কারণ, পাকপন্থী হুরিয়ত মুসলিম নেতারা ভোট বয়কট করার নির্দেশ দিয়েছিল। এমন হুমকিও দিয়েছিল যে নির্দেশ অমান্য করলে সামাজিক বয়কট থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতারা ভয় পেয়েছিল, কাশ্মীরে যদি অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় তবে তাদের মুখোশ খুলে যাবে। বিশ্ববাসীর কাছে বার্তা যাবে যে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক হিন্দুস্থানকেই পছন্দ করে— জেহাদি পাকপন্থীদের নয়। হুরিয়ত নেতাদের আস্ফালনকে তারা পরোয়া করে না। হুরিয়ত আসলে কাগুজে বাঘ। মিডিয়া এতকাল ওই কাগুজে বাঘকে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলে প্রচার করেছে। বিধানসভার নির্বাচনে ৬০ শতাংশের বেশি ভোটদাতার অংশ গ্রহণ এবং মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকপন্থী হুরিয়ত নেতারাই এখন

(এরপর ৪ পাতায়)

রায়মঙ্গল নদীপথে ঢুকছে বিস্ফোরক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত বাংলাদেশ জলসীমা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি, সেনা গোয়েন্দা বিভাগ এবং বি এস এফের গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে যে মতামত পাঠিয়েছে তাতেই এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী সুন্দরবন থেকে সামশেরগঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘ বাংলাদেশ জলসীমা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় বলে তারা রিপোর্ট দিয়েছে। অন্যদিকে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির দাবি, সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীই ভবিষ্যতে দেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হতে চলেছে। রায়মঙ্গল নদীই ভারত এবং বাংলাদেশকে ভাগ করছে। অথচ এই নদীতে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থা বিশেষ করে রাজ্য পুলিশের কোনও নজরদারি নেই। অবাধে এই নদীতে বাংলাদেশি জাহাজ চলাচল করছে। একেবারে তারা সোজাসুজি নামখানা পর্যন্ত চলে আসছে। মাঝপথে বার্জ, নৌকা কিংবা ট্রলারে বাংলাদেশী পতাকা খুলে ভারতের পতাকা লাগিয়ে নিচ্ছে। ভাষা, বেশ, চেহারা একইরকম হওয়ায় তাদের বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত করাও মুশকিল হচ্ছে বলে তারা

রাজ্য নিশ্চুপ

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

বিপদে উপকূল

ঘোর সংকটে সমুদ্র উপকূলের সুরক্ষা। ২০০৫-এর পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ওই বছর উপকূলের সুরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। ঠিক হয়েছিল সুরক্ষার জন্য ৭৩টি উপকূল স্টেশন রক্ষী, ৫৮টি আউট পোস্ট, ৯৭টি চেক পোস্ট, ২০৪ টি জলযানের ব্যবস্থা রাখা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উপকূলেই তা হয়নি। এরই মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরা উপকূলের এই দুর্বল সুরক্ষার সুযোগ নিয়ে মুম্বাই-এ হামলা চালিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সম্বন্বয়ের অভাবে, উপকূলের সুরক্ষা এখনও বিশবাঁও জলে। একাজে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষিত হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অবহেলিত

দলিত নেত্রীর রাজ্যেই দলিত শ্রেণীর মেয়েদের খাবার রান্না করতে, চেখে দেখতে ও বাড়ি নিয়ে যেতে বাধা। বাধা দিলেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মাধুরী পান্ডে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার তেজাপুর গ্রামে। সেখানে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের গৃহবিজ্ঞান পরীক্ষায় খাবার রান্না করা ও স্বাদ পরীক্ষা করার কথা ছিল। কিন্তু তারা দলিত— এই কারণে তাদের রান্না করতে দেওয়া হয়নি। এব্যাপারে পুলিশের কাছে এবং শিক্ষা বিভাগের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ খতিয়ে বিষয়টি দেখছে।

কয়েন জু

কলকাতার বুকে বসতে চলেছে কারেন্সি ও কয়েন মিউজিয়াম। কলকাতার পুরনো টাঁকশালটি মেরামত করে এটি তৈরি করা হবে। ১২ একর জমিতে এটি হতে চলেছে। সঙ্গে থাকছে থিয়েটার হল, পার্ক, হোটেলও। প্রজেক্টটি ২০১১ সাল নাগাদ শেষ হবে। পুরনো টাঁকশালটি চালু হয়েছিল ১৮২৪ সালে। দীর্ঘদিন অবহেলার পর আবার তা ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

নিশানায় গাড়ি

দিল্লীতে চার-চাকা গাড়ির চুরি বাড়ছে। খোদ রাজধানীর বুকে এঘটনায় চিন্তিত অনেকেই। দিন-দুপুরেই এক শ্রেণীর দুস্কৃতী একাজে হাত পাকিয়েছে। চলতি বছরে চুরির পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে। এবছর ৯৬১৫টি গাড়ি খোদ দিল্লী থেকেই চুরি গেছে। গত বছর যা ছিল ৮১১০টি। গত বছরের তুলনায় এবছর চুরি গেছে ১৫০০-রও বেশি গাড়ি। দুস্কৃতীদের ছলচাতুরিতে পুলিশও কিছু কূলকিনারা করতে পারছেনা।

বিপিও-তে বিপদ

বিপিও কর্মীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের পরিমাণ বাড়ছে। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসমীক্ষায় দেখা গেছে— যারা ডায়াবেটিসের রোগী তাদের ৩০ শতাংশ কলসেন্টারের কর্মী। দিন রাত এক করে এই সেবায় নিযুক্ত থাকে তারা। ফলে ঘুমের পরিমাণটাও কম। আর এই কারণেই মূলত মধুমেহ রোগ বাড়ছে তাদের মধ্যে। এই রিপোর্ট প্রকাশের ফলে এখন রীতিমতো চিন্তিত তারা।

গানে বেদ

আমেরিকার সংস্কৃত রক ব্যান্ড 'শান্তি শান্তি' প্রশংসনীয় উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই বেদের শ্লোক বা ঋচাগুলিকে নিয়ে গানের অ্যালবাম তৈরি করেছে। ঋচাগুলিকে কাহিনী গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলেও ব্যান্ড-এর পক্ষ থেকে জানা গেছে। অ্যালবামটির নাম রাখা হয়েছে 'বেদ'।

মোদী ভীতি

বেজায় চটেছেন ম্যাডাম। দিল্লী বিজয়ের পরও দলের মধ্যে মোদী প্রীতি দেখায় তিনি ঘরোয়া বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটা ঘটেছে দিল্লী কংগ্রেসের প্রধান জে পি আগরওয়ালকে নিয়ে। তিনি শীলা দীক্ষিতের বিজয়কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বারবার উল্লেখ করেন শীলা দীক্ষিত আমাদের মোদী, শুধু তাই নয়, তাঁর কথা অনুসরণ করে কংগ্রেসেরও একশ্রেণীর কর্মীর বক্তব্য শীলা দীক্ষিত, কংগ্রেসের নরেন্দ্র মোদী। আর এতেই চটে লাল ম্যাডাম সোনিয়া।

দোষের নয়

আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ দোষের নয় বলে স্পষ্ট মন্তব্য করলেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ওয়াশিংটনে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি জানান, পাকিস্তান কর্তৃক যদি ভারত বারবার আক্রান্ত হয়, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী কখনও সেই আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিলে তা নিয়ে অযথা হৈ চৈ করার কিছু নেই।

গোড়ায় গলদ

মুম্বাই বিস্ফোরণ নিয়ে অনেক কান্ডই ঘটে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের অপসারণ এবং সেইসঙ্গে অর্থমন্ত্রক থেকে সরিয়ে নিয়ে চিদম্বরমকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রদান। তদন্তের ব্যাপারে নতুন চিন্তা-ভাবনা। গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে কানাঘুষো। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই নাকি সুকৌশলে তুলতে দেওয়া হচ্ছে না বা তোলা হচ্ছে না বলে একশ্রেণীর গোয়েন্দা আধিকারিকের অভিমত। তাঁদের মতে গত কয়েক বছরে গোয়েন্দা দপ্তরে ব্যাপক রদ বদল এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যেভাবে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গোয়েন্দা বিভাগকে গড়ে তুলতে গড়িমসি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনও আলোচনা না হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখের।

বদলা

মুম্বাই বিস্ফোরণের ভয়াবহ স্মৃতিকে ভারতবাসী ভুলে গেলেও ভুলতে পারছেনা ইহুদিরা। কেননা এদিন কয়েকজন ইহুদি নাগরিক মারা গেছেন। ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত মার্ক সোফার বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে বলেন, যে কোনওভাবে এই হামলার জবাব দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতেও এই জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা হলে ইজরায়েল সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে অর্থাৎ এই সরকার না করলেও আগামী দিনে আদবানী যাতে প্রধানমন্ত্রী হলে উদ্যোগ নেন তেমনি ইঙ্গিত করেন তিনি।

অন্তরালের সহযোগী

সর্ষের মধ্যে ভূত নাকি অন্তরালের সহযোগী— এ প্রশ্নে রীতিমতো ধন্দে উচ্চপদস্থ গোয়েন্দারা। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে জঙ্গিরা পরিকল্পিতভাবে ভারতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্ত বিভাগগুলি ব্যবহার করছে। আধুনিক মোবাইল সংযোগ থেকে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে তারা দেশ থেকে বিদেশে সাবলীলভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলছে। এমনকী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নজরদারির ব্যবস্থাগুলোতে এমনভাবে সময়মতো গোলমাল সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে ওই সময়ের মধ্যে ওরা কাজ হাসিল করছে। অথচ সেভাবে কাউকেই সহায়ককারী হিসাবে চিহ্নিত করা না যাওয়ায় চিন্তিত গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

রাজ্যে অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ পাননি ৯৫৮৭ জন

হি. স, কলকাতা।। রাজ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার এপর্যন্ত যা জমি অধিগ্রহণ করেছে তার অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকরা এখনও ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। রাজ্যের ১৮টি জেলাতে যেসব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৯৫৮৭ জন ক্ষতিপূরণের টাকা হয় পায়নি, নয় নিতে অস্বীকার করেছেন। যারা ক্ষতিপূরণ নেননি বা পাননি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ হচ্ছেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার, ২৫৮৩ জন। এর পরেই রয়েছে বর্ধমান জেলার ২৪১০ জন। কোচবিহারে ১৯৭৮ জন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ১২৩৯ জন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রসঙ্গে জানান, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমির মালিকানা স্থির করা হয়নি। আবার কোথাও বর্তমান মালিকের মালিকানা পত্তন হয়নি বা মালিকদের উত্তরাধিকার স্থির হয়নি। আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা আদালতে কিংবা সরকারি কোষাগারে জমা রাখা হয়। যা পরবর্তীকালে মালিকানা স্থির হওয়ার পর প্রকৃত মালিকদের আইনানুগ পদ্ধতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ক্যালেকটারদের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এই ব্যাপারে ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৮৪-তে উল্লিখিত বিধানই যথেষ্ট বলে সরকার মনে করছে। কলকাতা ও দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়া রাজ্যের সব জেলাতেই অধিগৃহীত জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পাবেন। পূর্ব মেদিনীপুরে অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ তোলেননি ৩৭৮ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৩২ জন।

তীর্থকর বাতিল

গঙ্গাসাগর নিয়ে প্রশাসনের কাজিয়া

প্রাণ প্রতিম পাল ঃ কলকাতা ।। কথায় বলে, সবতীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। আর এই গঙ্গাসাগরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের কাজিয়া রীতিমতো সামনে এল। গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থকর বাতিল করা নিয়ে দক্ষিণ চবিবশ পরগণা জেলা পরিষদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বিরোধ এখন চরমে। প্রশাসনের সাথে জেলা পরিষদের বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসায় স্বভাবতই অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার।

দক্ষিণ চবিবশ পরগণার জেলা পরিষদ এবছর বামফ্রন্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নিজেদের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থকর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালের ১৪জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতি বছর পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করেন গঙ্গাসাগরে। পুজোও দেন কপিল মুনির আশ্রমে। রাজ্য সরকার মাথা পিছু ৫ টাকা করে তীর্থকর চালু করেছিল। এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় ওই তীর্থকর বাতিল করতে উঠে পড়ে লেগেছে জেলা পরিষদ। আগামী নির্বাচনে হিন্দু ভোট টানতেই তৃণমূল সুপ্রীমোর এই নতুন পদক্ষেপ বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দক্ষিণ চবিবশ পরগণার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামিমা শেখ বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে প্রশাসন স্টীমারের (যাত্রী পরিবহনের জলযান) ভাড়া বৃদ্ধি করছে। জমির লিজের পরিমাণ ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা স্কোয়ার ফুট করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। জেলা শাসক আমাদের সাথে কোনও রকম আলোচনা না করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকী মেলা প্রাঙ্গণে পার্কিং ফি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তবে এসব কিছু জেলা শাসক রাজ্য সরকারের নির্দেশেই করছেন বলে অভিযোগ করেন সভাধিপতি।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে তীর্থকর বাতিল সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলা থেকে তীর্থকর আদায় হয়েছিল ১১ লক্ষ টাকা। তীর্থকর তুলে দিয়ে এবছর সমপরিমাণ টাকা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জেলা পরিষদ। তীর্থকর প্রসঙ্গে জেলাশাসক সংঘমিত্রা ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে গঙ্গাসাগর মেলায় জঙ্গি হামলা রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। তীর্থকর বাতিল নিয়ে দুই বঙ্গ নারীর কাজিয়া শেষ অবধি কোথায় গিয়ে পৌঁছায় সেটাই এখন দেখার।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যুদ্ধই শেষ বিকল্প

পাক-সন্ত্রাসবাদীদের মুম্বাই-এর উপর হামলা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই নামান্তর। বস্তুত পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারিই রাখিয়াছিল। পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীদের তাণ্ডব এবং সেই সমস্যা সামলানোর পরে পরেই কাশ্মীরে জঙ্গি সন্ত্রাস ছিল পাকিস্তানি যুদ্ধের অঙ্গ। ক্রমে ক্রমে পাকিস্তান এই যুদ্ধের প্রসার ঘটাইয়াছে ভারতের আরও ভিতরে, প্রায় সব রাজ্যেই। দিল্লীতে লালকেল্লা ও সংসদ ভবন আক্রমণসহ বারবার বিস্ফোরণ, মুম্বাইয়ে দফায় দফায় জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস, ব্যাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদে বিস্ফোরণ, আমেদাবাদ ও জয়পুরে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরন্তর হাঙ্গামা এবং একই সঙ্গে জনভারসাম্যের বিচ্যুতির লক্ষ্যে অনুপ্রবেশের মতো নীরব আক্রমণ —এই সবই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মুম্বাই-এ ২৬।১১-র নরসংহার সেই চলমান যুদ্ধেরই একটি অঙ্গ।

ভারত সরকার পাকিস্তানকে ইহার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ইসলামাবাদের কাছে ২০ জন জঙ্গির তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের ফেরৎ চাহিয়াছে। পাক-অধিকৃত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের শিবিরগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি পাঠাইয়া সেগুলিকে অবিলম্বে ধ্বংসের দাবি জানাইয়াছে। পাকিস্তান কোনও কিছুতেই কর্ণপাত করে নাই। অবশ্য এই অভিযোগ যে অসত্য ভারত সরকার তাহাও জানাইয়া দিয়াছে। সম্প্রতি কাসভ ইস্যুতে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন)-এর নেতা নওয়াজ শরিফ জানাইয়াছিলেন, মুম্বাই হামলার সঙ্গে যুক্ত একমাত্র ধৃত জঙ্গি আজমল কাসভ পাকিস্তানেরই নাগরিক এবং তাহার বাড়ি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের ফরিদকোট। শ্রীশরিফ বিশ্ববাসীর সামনেই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ফলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সমাজে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়িয়াছিল, তেমনই বিশ্বসভায় বেল্লিকও বানিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনিও দুইদিনের মধ্যেই নিজের বক্তব্য হইতে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়া গিয়া জানাইয়াছেন, কাসভ পাকিস্তানী বলিয়া তাহাদের কাছে কোনও তথ্য নাই। পাকিস্তানের শাসক ও বিরোধী দলের অধিকাংশ নেতাই যেখানে এই রকম দ্বিচারিতা করেন, সেখানে তাহাদের কাছে সুষ্ঠু আচরণ আশা করাটাই তো অবান্তর।

অথচ ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় গত একমাস ধরিয়া শুধু একথাই বলিয়া চলিয়াছেন যে ইচ্ছা করিলেই ভারত পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেই গল্পের মতো—স্বামী তাহার স্ত্রীকে চেঁচাইয়া বলিল, স্নানের জন্য এখনই জল গরম করিতে হইবে। কিছুক্ষণ পর সেইকথা সে আবার বলিল। পাশ হইতে তাহার এক বন্ধু বলিল, বৌদি যদি না দেয়, তাহা হইলে কি করিবে? সে বলিল, তাই হইলে স্নানই করিবে না। বস্তুত ভারত সরকার কখনও এই যুদ্ধের মোকাবিলা করে নাই। মুম্বাই-এ সন্ত্রাসবাদীদের আবার হামলা সেই আত্মপ্রতারণারই ফল।

শ্রী শরিফের এই ডিগবাজির পিছনে রহিয়াছে পাক আর্মি, পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এবং জঙ্গি মোল্লারা। জারদারি বা গিলানিরা নামেই প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী। জারদারি, গিলানি বা শরিফ — এদের হাতের পুতুল। পাকিস্তানের নির্বাচিত অসামরিক শাসকের কোনও কথার কোনও দিনও মূল্য ছিল না। অথচ আমাদের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, পাকিস্তানের আসল নিয়ামক যে কে সেটাই তো বোঝা যায় না। এত সবের পর বিদেশমন্ত্রীর এই উক্তিকে কি বলিবেন?

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ করিয়া তালিবানী গোষ্ঠীর জঙ্গিদের সহিত যে একটা দহরম-মহরম রহিয়াছে, সেই কথা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা। সন্ত্রাসবিরোধী কাজে পাকিস্তান নামিলেও তাহা যে শুধুই লোক-দেখানো সেকথা বুঝিতে কারোই অসুবিধা হইবার কথা নয়। এমনকী পাকিস্তানের মুরুব্বি আমেরিকারও সেই কথা ভালোই জানা আছে। কিন্তু পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু চাপে রাখিতে চায়, যেহেতু এমনটাই ধারণা করা হইতেছে যে, আফগানিস্তান হইতে বিতাড়িত ও উৎখাত হওয়া তালিবানী জঙ্গিরা পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ ওয়াজিরিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলেই ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছে এবং বিশ্বত্রাসী ওসামা-বিন-লাদেন-এর জঙ্গি সংস্থা আল-কায়েদার জঙ্গিরাও পাকিস্তানের ওই অঞ্চলেই ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালী ছাড়িতে চায় না। ভারতের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মাঝে মধ্যে বক্তব্য রাখিতেছে ও পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে তাহা যে কতটা লোক-দেখানো আর কতটা সঠিক সেকথা নিশ্চয়ই করিয়া বলা সম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকায় এখন পালা বদলের পালা চলিতেছে। নবনির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা জর্জ বুশের স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন। অতএব অন্তবর্তীকালে তাহারা কেউই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

অন্যদিকে চীন যখন পাকিস্তানকে তাহাদের সহিত পরমাণু চুক্তি করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে, তখন ভারতের বিরুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে কাজে লাগাইবে না — এমন চিন্তা বালিতে মুখ গুঁজিয়া বিপদ এড়াইয়া যাওয়ার নামান্তর। বস্তুত, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুঁটির জোরেই পাকিস্তান লাফালাফি করিতেছে। এই জোরেই পাকিস্তান পূর্ব সীমান্ত জুড়িয়া 'রণং দেহি' মনোভাব লইয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়া চলিতেছে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা চীন পাকিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং যুদ্ধবাজ পাকিস্তানকে যুদ্ধ বিমুখী করিয়া তুলিবে — ইহা দুরাশা মাত্র।

গত ৬১ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান বারবার প্রমাণ করিয়াছে যে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। পাকিস্তানকে বিশ্বাস করিয়া ভারত বারবার ভুলই করিয়াছে। আমরা কি আরও একটি মুম্বই হানার মতো ঘটনা ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব? এইবারও যুদ্ধের আবহ তৈরি হইয়াছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের হাতে শেষ বিকল্প। এই পরিস্থিতিতে ভারত আর কত দিন সহ্যের পরিচয় দেবে?

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি

গিরিজাশঙ্কর দাস

ইংরাজিতে একটি কথা আছে 'হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ'—ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মের ইতিহাস হয়তো বা হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ এস জে মার্শালের মতে, হিন্দুধর্মের নিদর্শন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় থেকেই পাওয়া যায়। বস্তুত হিন্দুধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম। ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি বৌদ্ধ, খৃস্ট ও ইসলাম ধর্মের। এইসব বিদ্রোহী মতের আঘাত তথা প্রতিকূল অবস্থা থেকে হিন্দুধর্ম আজও পৃথিবীতে প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে এবং প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী, সহস্র সহস্র মোক্ষকামী লোকদের কাছে হিন্দুধর্ম আজও আকর্ষণের কেন্দ্র। অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে, 'ঋষিদের ধর্ম, সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্মের ভিতর সাকার-নিরাকার সবরকম পূজা আছে, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যেসব ধর্ম, আধুনিক ধর্ম কিছুদিন থাকবে, আবার যাবে।' ইসলামেও এর সমর্থনে বলা হয়েছে। হাদিসে আছে— 'ইসলাম অল্পসংখ্যক মুসলমান নিয়ে সুরু হয়েছে, শীঘ্রই সেইভাবে শেষ হবে।'-(মুসলিম বর্ণনায় আবু হোরায়রা)।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—পৌরাণিক, অপরটি ঐতিহাসিক, অনেকে আবার পৌরাণিক ইতিহাসকে কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ফ্রান্সে এক বক্তৃতায় বলে গিয়েছেন, 'যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশ প্রত্নতত্ত্ব উদঘাটনের সঙ্গে প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিংবদন্তী সকল সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিংবদন্তীর রহস্যের উদঘাটন করেন।' বর্তমান রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকে বিরোধীপন্থীরা যতই কাল্পনিক বলছেন ততই এগুলোর অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে এবং এগুলিকে এখন আর নিছক কল্পকাহিনী রূপে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পৌরাণিক ইতিহাস মোটামুটি দৈত্য-রাক্ষস-অসুরকুলের বিনাশের কাহিনী। যারা ধর্মের নৈতিকতা স্বীকার করেনি বা যারা মানুষের প্রচলিত ধর্মে বা বিশ্বাসে আঘাত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরই বিনাশ করতে অবতার পুরুষ, দেবদেবী ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের সংহারের পর মানবরূপী সেইসব অবতার পুরুষ বা দেবদেবীরা ভারতের লোকদের কাছে আজও পূজ্য হয়ে রয়েছেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করে মুনি-ঋষিদের নিশ্চিন্ত মনে তপস্যার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এরপর ৫৫০০ বছর পূর্বের মহাভারতে যে কাহিনী বলা হয়েছে তা সর্বকালের সর্বদেশের রাজনীতিতে সমভাবে উদাহরণস্বরূপ হয়ে আছে।

পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন কোনও নীতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হননি, তেমনি আমাদের দেশের বর্তমান সরকার ভোটব্যাঙ্কের স্নেহে বা লোভে কোনও নীতিতে দৃঢ় থাকতে পারছেনা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেইদিকেই এগোচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকার। পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে যেমন রাজ্যকে ভাগ করে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, ঠিক সেইভাবে দুই জাতির কাছে দেশ ভাগ হয়ে গেল ভারত ও পাকিস্তান নামে। দুষ্টের শিরোমণি দুর্যোধন যেভাবে পাণ্ডবদের অত্যাচার করেছেন তেমনি আরেকটি দেশ স্বরূপে বা ছদ্মরূপে ভারতবর্ষে যথেচ্ছ আক্রমণ, হত্যা, নরমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। মহাভারতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধির জন্য বার বার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধনের উপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি। অবশেষে দু'পক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন সমরাঙ্গণে যুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ কল্পনা করে যখন অস্ত্র পরিত্যাগ করতে চাইলেন তখনই উচ্চারিত হল শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে সবধর্মসার শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার বাণী। বললেন — 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।।' আরও বললেন — 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।' গীতার এই বাণীগুলিই হিন্দুধর্মকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, ধর্ম রুখে দাঁড়িয়েছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। সহনশীলতা শিখিয়েছে হিন্দুধর্ম কিন্তু নীরবে অত্যাচার অনাচার সহ্য করা শেখায়নি।

খৃস্টীয় ১১০০ শতকে। মুসলিম লুটেরা হানাদার বাহিনীর নিকট হেরে গেলেন হিন্দু রাজারা। ভারতবর্ষে শুরু হল আরেক অধ্যায়। কিন্তু তার আগে খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরেক মহাপুরুষ আদিগুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চার কোণে চারটি মঠ স্থাপন করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও হিন্দুধর্ম সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করে গেছেন। পরাজিত হিন্দু রাজারা মুসলিম লুটেরাদের সঙ্গে মেয়ে-বোনদের বিয়ে দিয়ে এক আত্মীয়তায় আবদ্ধ হতে চাইলেন। রাজা-মহারাজাদের দেখাদেখি প্রজারাও মুসলিম সিপাহীদের সঙ্গে একইভাবে শান্তি কামনায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইল। পরিবর্তে তারা পেল কাফের বলে চরম ঘৃণা আর ভর্ৎসনা। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু মহিলারা এদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। বিপদ গুণলেন হিন্দুধর্মের পুরোহিতরা। হিন্দু সমাজকে আহ্বান জানানো হল এদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না করার জন্যে। এমনকী বলা হল এদের হাতে জল যে খাবে তার শুধু জাত নয় ধর্মও যাবে। শুরু হল মুখে জল ঢেলে জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করার অপবৃত্তি। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তুলসী দাস, কবীর, গুরু নানক, শঙ্করদেব, সন্ত তুকারাম আবির্ভূত হয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারে ও ধর্মান্তর রোধে প্রবৃত্ত হলেন। তাতেও কাজ হল না। এরই মধ্যে প্রায় সমগ্র কাশ্মীরের অধিবাসীরা মোল্লা-মৌলবীদের হাতে জলপান করে ধর্মান্তরিত হয়ে গেল।

ভারতে সম্রাট আকবরের শাসনকাল তখনই চলছে। আকবরের এক প্রিয়তম মহিষী একবার গুরুতর অসুস্থ হলেন। বৈদ্য, হাকিমরা হার মানলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী আকবর একের পর এক সন্ন্যাসী-ফকিরদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই কোনও কাজ হচ্ছে না। অতপর খবর পেলেন এক সন্ন্যাসীর, যিনি আগ্রার নিকটে যমুনা তীরে নির্জনে সাধনা করছিলেন। সম্রাট ছুটলেন তাঁর কাছে। সন্ন্যাসী জানালেন — তিনি সন্ন্যাসী, ওষুধপত্র তাঁর জানা নেই। সম্রাট যেন তাঁকে সাধনার অবসর দেন। কিন্তু হটবার পাত্র নন সম্রাট। সন্ন্যাসী অবশেষে সম্রাটের হাতে তাঁর সম্মুখে থাকা প্রদীপের তেল ঢেলে দিলেন, বললেন ওটি খাইয়ে দেখতে। সেই তেল খাওয়াতেই মহিষী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিছুদিন পর সম্রাট হাতি-উট-ঘোড়া বোঝাই দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। আঁতকে উঠলেন সন্ন্যাসী, সম্রাটকে বললেন — ছিঃ ছিঃ আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছি, আমার এসব কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সম্রাট যত জোর করেন, সন্ন্যাসী ততই পিছিয়ে যান। এবার হার মানলেন সম্রাট, বললেন — এরপর সন্ন্যাসীর যদি কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় তবে তা প্রথমেই তাঁর কাছে চাইতে হবে। বাক্যবদ্ধ হলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, জন্ম হয়েছিল বঙ্গদেশেই ঢাকার কাছে।

খবরটি পৌঁছল হিন্দুধর্মের সংরক্ষকদের কাছে। তারা ছুটে এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। সম্রাটের কাছে সন্ন্যাসী যেন মোল্লা-মৌলবীদের মুখে জল ঢেলে ধর্মান্তরিত করার অপবৃত্তি করার কথা বলেন। সম্রাট সম্মত হলেন না। বললেন, অন্য কিছু চেয়ে নিতে। কারণ তা করতে গেলে তাঁর বাদশাহী থাকবে না এবং তা হলে তাঁর আদেশের কোনও দাম থাকবে না। জল্পনা-কল্পনা চলল হিন্দু নেতাদের মধ্যে। এবার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী

(এরপর ১৩ পাতায়)

"বিগত পনেরো বছর ধরে দেশে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে মুসলিম আতঙ্কবাদীরা। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে ওইসব ঘটনায়। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতো নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছেন আমাদের সরকার। অন্ধ রাজার পুত্রস্নেহের মতো বিষম স্নেহ এখন অনেক রাজনৈতিক দলেরই ভোটব্যাঙ্ক। এমনকী বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সংসদ ভবন হামলাকারীকে ফাঁসি দিতে ভয় পাচ্ছে আমাদের সরকার।"

ন'দিন ব্যাপী ভাগবত কথা জ্ঞান -যজ্ঞ সম্পন্ন হল কলকাতায়

প্রাণ প্রতিম পাল ।। ভারতের বনবাসী তথা জনজাতি এলাকায় শিক্ষা, সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক চেতনা প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ দেবী ভাগবত কথার আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়। উদ্যোক্তা শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, কলকাতা। গত ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠান চলে ১ জানুয়ারি '০৯ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ভাগবত কথা জ্ঞান-যজ্ঞকে ঘিরে কলকাতার চৌরঙ্গী রোডের শক্তিধাম ময়দান ছিল উৎসব মুখর। অনুষ্ঠানের আয়োজন নজর কেড়েছিল সবার।

দেবী ভগবতী অর্থাৎ দুর্গা। আর এই দুর্গার মহিমার কথা হিন্দুদের অজানা নয়। দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের মহিমার কথা প্রচারের আয়োজন করেছিল সমিতি। প্রবচনের জন্য হরিদ্বার থেকে নিয়ে আসা হয় পূজ্যা সন্তোষী মাতাকে। মহামন্ডলেশ্বর পূজ্যা সন্তোষী মাতার প্রবচন শুনতে হাজির হয়েছিল ভক্তরা। কলকাতাসহ শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা এসেছিলেন শক্তিধাম ময়দানে। ভক্ত সমাগমে সরগরম ছিল ময়দান। ন'দিনের এই অনুষ্ঠানে দুর্গার পূজা-অর্চনা করা হয়। পাশাপাশি চলে ভগবতীর নয়টি রূপের ব্যাখ্যাও।

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি বনবাসী সমাজে শিক্ষা, সংস্কার আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত করার কাজে ব্রতী। সমাজের নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন সংগঠনের সদস্যরা। শুধু তাই নয়, বনবাসী সমাজে স্বাভিমান জাগ্রত করার চেষ্টাও চালাচ্ছেন তারা। এর পাশাপাশি ভগবত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাভাব জাগানোর কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি প্রতিবছর এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সমিতি তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে, বনাঞ্চলে হরিকথা-র মাধ্যমে জনজাতি সমাজের মধ্যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শক্তিধাম ময়দানে একদিকে পূজ্যা সন্তোষী মাতার প্রবচন, অন্যদিকে ১০৮ জন যজমান পুরোহিতকে ওইদিন ভাগবত পাঠরত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। বর্তমানে সারা ভারতে ১৫০০ জন প্রশিক্ষিত কথাকার রয়েছেন। সমিতির সম্পর্কিত গ্রামের সংখ্যা ২২,৫৬১টি। এছাড়া ১২,১১৬টি সৎসঙ্গ কেন্দ্র রয়েছে। ১৮,১২৮টি গ্রামে গ্রাম সমিতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বনবাসী অঞ্চলে ধার্মিক, আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক অভিরুচি সম্প্রসারণে ১৯টি শ্রীহরি রথের (ভি ডিও) মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালান হচ্ছে। *(এরপর ১৬ পাতায়)*

শ্রীহরি সৎসঙ্গের আগামী পরিকল্পনা

প্রকল্প	বর্তমান	লক্ষ্য ২০০৯-১০
প্রশিক্ষিত কথাকার	১,৫০০	৩,০০০
শ্রীহরি রথ (ভিডিও রথ)	১৯	৩০
সম্পর্কিত গ্রাম	২২,৫৬১	৫০,০০০
সৎসঙ্গ কেন্দ্র	১২,১১৬	৩০,০০০
গ্রাম সমিতি	১৮,১২৮	৫০,০০০

হিন্দুত্বের বিরোধিতা করলে ভোট নয় ঃ শ্রীসুদর্শন

(১ পাতার পর)

শ্রীসুদর্শন বলেন, একজন রাজনৈতিক নেতার কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচন পর্যন্ত থাকে। একজন কূটনীতিকের লক্ষ্য এক দশক (দশ বছর)। কিন্তু একজন সমাজ সংস্কারকের কাজের পরিধি বা কালসীমা কমপক্ষে একশত বছরের হয়। একশ বছরের আগে তাঁর কাজের পরিণাম দেখা যায় না। সঙ্ঘের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে, আমরা 'হিন্দু' — এর মানে কি? তা কি হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করার জন্য অথবা শুধু হিন্দু নাম রাখার জন্য? একজন আমেরিকান যদি হিন্দু নাম রাখে তবে কি তাকে হিন্দু বলা যাবে? তা নয়। হিন্দু মানে — বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী সমাজ।

শৃঙ্গেরীর শংকরাচার্যকে এক আমেরিকান খৃস্টান তাকে হিন্দু করার কথা বলাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন — পৃথিবীতে মানুষ হিন্দু হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। পরে সে ব্যাপটিজমের মাধ্যমে খৃস্টান এবং সুন্নত করে মুসলমান হয়।

খৃস্টানরা বিশ্বাস করে কেউ খৃস্টান না হলে তার মুক্তি নেই, তাহলে যারা যীশুর জন্মের আগে জন্মেছে অথবা যারা এখনও যীশুর নামই শোনেনি তাদের কি হবে? ভগবান কি এতই পক্ষপাতী যে অন্যদেরকে তিনি কৃপা করবেন না।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার হল বেদ, বেদের মধ্যে রয়েছে — ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ লোককল্যাণে রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ ও তপস্যা করেছেন। রাষ্ট্রদেবতার উপাসনা করেছেন। বেদের সূক্তে ব্যক্ত হয়েছে —

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ
তপোদীক্ষাম্ উপাসেদুরগ্রে,
ততো রাষ্ট্রম্ বলমোজশ্চ জাতম্
তদস্মৈ দেবাঃ উপসংনমন্তু ।।

আমাদের এই রাষ্ট্র বা জাতি (Nation) পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। হিমালয়ের মতো সর্বোচ্চ। কিন্তু সময়ে সময়ে পতনও হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের মতো রাষ্ট্রের জীবনেও উত্থান-পতন আছে। রাষ্ট্রচক্রের অক্ষদণ্ড অর্থাৎ ধুরাকে সমাজ যত জোরে ধাক্কা দেবে রাষ্ট্র পরিবর্তনের চাকাটা ততটা জোরে ঘুরবে। আর যদি মোটর বসানো হয় তাহলে চাকা জোরে অনবরত ঘুরবে। সমাজে পতনের কারণে ভারত আটশো বছরের পরাধীনতা ভোগ করেছে। এদেশের মূল হল আধ্যাত্মিকতা। সেজন্য হিন্দুসমাজ বিলুপ্ত হয়নি। মিশর, ব্যবিলন, রোম, গ্রীস তাদের সেই প্রাচীন পরিচয় নিয়ে এখন আর নেই। বদলে গিয়েছে। মহাভারতের কাল ছিল পতনকাল। পতনের প্রতিভূ ছিলেন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য। তাঁরা প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় প্রতিবাদ করেননি। তখন একমাত্র প্রতিবাদী ছিলেন বিদুর। মহাভারতের যুদ্ধে ১৮ অক্ষৌহিনী সেনা শেষ, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্'। ভারতের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন এখনও ইউরোপ, আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় বিদ্যমান রয়েছে। ২০০৩ সালে জয়পুরে কোয়েম্বাটুরের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে এক সম্মেলন হয়েছিল — World Congress of Indigenous Faith। সেখানে পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা ১৫দিন ধরে ভারতীয়দের বাড়িতে ছিলেন। ফ্রান্সের এক মহিলা প্রতিনিধি মেজর সুরেন্দ্র মাথুরের বাড়িতে ছিলেন। তিনি মেজর মাথুরের বাড়িতে ঠাকুরঘর দেখেছিলেন। তিনি ফ্রান্সে ফিরে মেজর মাথুরকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। মেজর মাথুর ফ্রান্সে গেলে তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতিতে উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ওই মহিলার বাড়িতে মাথুরজী আমাদেরই বাড়ির মতোই ঠাকুরঘর দেখেন। পরে তাঁকে এক জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও তাঁকে ক্ষয়িষ্ণু পাথরের দেবমূর্তি এবং ঠাকুরঘর দেখানো হয়। ওখানে জঙ্গলের মধ্যে ৮০ বছর বয়স্ক এক পুরোহিত মাথুরকে ভারতীয় জেনে তাঁকে অলিঙ্গন করেন। বলেন, "আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রন্থে লেখা আছে — ভারত থেকে একজন কেউ আসবে আর তিনি আসার পর সুদিন আসবে।" ইউরোপে ৬০ লক্ষাধিক 'ড্রুজ' আছে। মেজর মাথুর পরে ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক 'ড্রুজ'দের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। 'ড্রুজ' হল 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ।

মেজর সুরেন্দ্র মাথুরের বাবা ইংলন্ডের মহারানীর দরবারে কাজ করতেন। মেজর মাথুর মহারানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তিনি মহারাণীর বসার আসনে সূর্যচক্রের চিহ্ন দেখতে পেলেন। মহারানী কথায় কথায় স্বীকার করলেন তিনি সূর্যবংশীয়। তাঁর কাছে ৫০ পয়সার মুদ্রা আছে। মুদ্রার একপিঠে মহারাণীর ছবি, অন্যদিকে সিংহবাহিনী মা দুর্গার ছবি রয়েছে।

হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্ব সঞ্চারের এমন অনেক পদচিহ্ন পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বার বার পতন হয়েছে। আর কোনও কোনও মহাপুরুষ এসে উদ্ধার করেছেন, সমাজ সংস্কার করেছেন। পশুবলির কুসংস্কার শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে। তখন এলেন ভগবান বুদ্ধ, দশাবতারের একজন। চীন-জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম পরিব্যাপ্ত হল। আবার পতন। এলেন জগৎগুরু আদি শংকরাচার্য। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলে কুসংস্কারের কারণে কেরলে প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন মুসলমান হয়ে জীবিকার পথ খুঁজেছিল। মোপালা, মালাপ্পুরম্ এবং মোপালাস্তান তৈরির দাবিতে আন্দোলনের জন্ম। শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করার ফলে এই পতন।

১৯৪৭ সালে ইংরেজদের কূটবুদ্ধিতে জওহরলাল নেহরু দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিতে ভারতের নয়, ইংলন্ডের ছাপ ছিল। কেননা তিনি পাঁচ বছর বয়স থেকে ইংলন্ডে ইংরেজ আয়া বা গভর্ণেস-এর হাতে বড় হয়েছিলেন।

এরপর একের পর এক মহাপুরুষ এদেশে জন্মেছেন। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের রক্ষা করেছেন। বিগত ৬১ বছর ধরে দেশ ভুলপথে পরিচালিত হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন — দেশভাগকে যে কোনও উপায়ে রোধ করতে হবে।

এদেশের আর্থিক রচনার ব্যাপারে সুদর্শনজী বলেন, ভারতে গান্ধীজীর পথে গ্রামকেন্দ্রিক, স্বল্প পুঁজিতে বেশি কর্মসংস্থানকারী ও কম বিদ্যুৎ (উর্জা) লাগে এরকম পরিকল্পনা দরকার। জওহরলাল গান্ধীজীর ওই পথকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

শ্রী সুদর্শন আরও বলেন, হিন্দু সমাজ এদেশের মেরুদণ্ড। আর যে ভারতকে মা বলে মনে করে, ভারতের সংস্কৃতিকে মানে, যে বিশ্বাস করে যে কোনও পদ্ধতিতে উপাসনা করে ঈশ্বরলাভ করা যায় সেই হিন্দু। আল্লা বা যীশুর উপাসনাতে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। এখন হিন্দু সমাজকে জাত-পাতের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হচ্ছে। সঙ্ঘের কাজের ফলে রামজন্মভূমি, রামসেতু রক্ষা, অমরনাথ জমি ফেরৎ আন্দোলন সফল হয়েছে। আমাদের কাজের মূল হল দৈনিক শাখা। এদেশের রাজনৈতিক নেতারা মুসলমানদের তোষণ করছেন, হিন্দুদের একজোট হয়ে বলতে হবে — হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করলে ভোট দেব না। তাহলেই আমাদের কাঙ্খিত পথে পরিবর্তন আসবে।

এদিনের সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভায় নাগরিকদের মধ্যে মায়েদের সংখ্যা ছিল বেশ ভালো। সভার আগে গণবেশে স্বয়ংসেবকদের দুটি পথসঞ্চলন সভাস্থল থেকে দু'দিকে বের হয়ে আবার সভাস্থানে শেষ হয়। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার সরসঙ্ঘচালকজীর পরিচয় করিয়ে দেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক হেমন্ত কুমার বর্মা, বিদ্রোহী সরকার এবং সত্যনারায়ণ মজুমদার।

রায়মঙ্গল নদী দিয়ে

(১ পাতার পর)

জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম সম্প্রতি কলকাতায় এসে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিজিকে ডেকে একথা জানিয়ে গিয়েছেন। রায়মঙ্গল নদী দিয়ে অবাধে জঙ্গিরা যে এরাজ্যে চলে আসছে তাও জানান চিদাম্বরম। তাঁর যুক্তি, ১৯৯৩ সালের দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাইয়ের সমুদ্র পথ ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এরপর ২০০৮ সালে আবার দেশের পশ্চিম-উপকূলের সমুদ্র ব্যবহার করে জঙ্গি কার্যকলাপ হল। একইভাবে পূর্ব-উপকূলে বাংলাদেশ থেকে হুজি, জামাতের জঙ্গিরা রায়মঙ্গল ব্যবহার করে বিস্ফোরক, অস্ত্র-শস্ত্র এরাজ্যে পাঠায়।

রাজ্য সরকারকে এনিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনেই রাজ্যের দুই কর্তা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সীমা রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। রাজ্যের কী করার আছে? রাজ্যের হাতে এত পুলিশ, নৌকা নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে আরও সতর্ক হয়ে রায়মঙ্গল দিয়ে গরু পাচার, বিস্ফোরক পাচার ও আমদানি বন্ধ করতে হবে।

কাশ্মীরের নির্বাচন গণতন্ত্রের জয়

(১ পাতার পর)

কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে তাই তারা হুমকি দিয়েছে যে "গদ্দার" ভোটদাতাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে। হুরিয়তের হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমানরা দলে দলে পথে বেরিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। মিটিং-মিছিল করেছে। তাই কাশ্মীরের নির্বাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়। হিন্দুস্থানের জাগ্রত জাতীয়তাবোধের জয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদ নীতির জয়। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের জয় নয়। হ্যাঁ, বিশ্ববাসীর কাছে এই বার্তাই গেছে।

জম্মুতে বিজেপি-র অভূতপূর্ব নির্বাচনী সাফল্যকে মিডিয়া দেখাতে চেয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জয়। বিজেপি হিন্দুত্ববাদের তাস খেলে বাজি জিতেছে। কথাটা এইভাবে বলা হলে তা হবে জম্মুর মানুষকে অপমান করা। বরং বলা যেতে পারে যে এই প্রথম জম্মুর সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। অমরনাথ জমি বিতর্কে গুলাম নবি আজাদের কংগ্রেসসহ কাশ্মীর উপত্যকার প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারা বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই হাত মিলিয়ে ছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল কাশ্মীর উপত্যকার এক ইঞ্চি জমিও হিন্দুদের দেওয়া হবে না। এমনকী রাজ্য বিধানসভায় অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের সাময়িক বিশ্রামাবাস স্থাপনের জন্য সরকারি জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদনের পরেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল, জমি দিলে কাশ্মীরে রক্তের নদী বইবে। ধান্দাবাজ উগ্র সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের এই বজ্জাতির বিরুদ্ধে জম্মুর হিন্দু ক্ষাত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ায়। রাজ্য সরকারকে বাধ্য করে জমিদানের প্রতিশ্রুতি পালনে। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুরা রুখে দাঁড়ালেই মিডিয়া প্রচার করবে — "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ" বলে। প্রচার করা হবে আর এস এসের হিন্দুত্ব তাস খেলে জম্মুতে বিজেপি বাজি জিতেছে। উপত্যকার প্রধান দুইটি দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পি ডি পি) মিডিয়ার চোখে ধোয়া তুলসী পাতা।

এই দুটি দল কোনওদিনই বলে না যে তারা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক দল। বলে যে তারা কাশ্মীরের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দল। অর্থাৎ, কাশ্মীর উপত্যকায় বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দল। কারণ, এই উপত্যকায় একদা বসবাসকারী হিন্দুদের শিকড় সমেত উপড়ে ফেলে বিতাড়িত করেছিল শেখ আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স। এবং সেই হিন্দু বিতাড়নে কংগ্রেস পূর্ণ মদত দিয়েছিল। এই দুটি দলের সমর্থক ও নেতারা সকলেই ১০০ শতাংশ মুসলিম।

এই দুই দলের সঙ্গেই পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কিন্তু মিডিয়া কোনওদিনই বলে না ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পি ডি পি মুসলিম তাস খেলে কিস্তি মাত করেছে। এই দুই দলের ঘোষিত নীতি হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা করা। তবু মিডিয়ার চোখে তারা ধর্মনিরপেক্ষ, ধোয়া তুলসী পাতা।

কর্মসংস্থানের বুজরুকি ধরা পড়েছে

নতুন যুবা-রা ভিড়ছে না দলে

নিশাকর সোম

সম্প্রতি সিপিএম-এর যুবসংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রকাশ্য সমাবেশ দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। ব্রিগেড-এ প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধ দেববাবু তাঁর বক্তৃতায় সেই পুরানো কায়দায় ঝাঁজালো বক্তৃতা করলেন। বুদ্ধ দেব তো বেশি রাজনৈতিক গ্রন্থাদি পড়েননি। তাই তাঁকে বলছি এম কালিনিন-এর 'অন কমিউনিস্ট এডুকেশন' পুস্তক-এ যুবদের উদ্দেশে লেখাটি পড়ে দেখতে। এবং মাও জে দুং ও হো চি মিন-এর যুবকদের উদ্দেশ্যে লেখা প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখবেন। আমার কথার সমর্থন মিলতো যদি অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্ত বেঁচে থাকতেন।

পীযূষবাবুর ভাই শঙ্কর দাশগুপ্তও যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন। বুদ্ধবাবু মেঠো বক্তৃতা করতেই অভ্যস্ত। বুদ্ধবাবুর বক্তব্যেই তো পার্টির যুব-কর্মীরা মারমুখো রাজনীতির দীক্ষা পেয়েছেন। দোহাই বুদ্ধ বাবু, পারসুয়েসিভ বক্তৃতা করুন—মারদাঙ্গা বাচনিক বিষ ছড়িয়ে আর হাঙ্গামাতে উস্কানি দেবেন না। কোনও মুখ্যমন্ত্রীর এ আচরণও সঠিক নয়।

যদিও ব্রিগেড ভরেনি তবুও শত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ব্রিগেডে উনুন জ্বালিয়ে ফিস্টের ব্যবস্থা ছিল। পার্টি হুইপ ছিল বলেই যা কিছু জমায়েত — যুবদের নতুন অংশ আর এদের কাছে ভিড়ছে না — ভিড়বে না। কারণ তাঁরা কর্মসংস্থানের বুজরুকি ধরে ফেলেছে। শুধু কম্পিউটার কেন্দ্র-এর বিস্তৃত জাল ফেঁদে যুবদের সামনে খুড়োর কল দেখানো হচ্ছে — গাজর দেখিয়ে ঘোড়াকে যেমন ছোটানো হয় — তেমনি যুবদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে।

বুদ্ধবাবুর দ্বিচারিতা স্পষ্ট হল — তিনি যখন সম্মেলনের গোপন অধিবেশনে যুব কর্মীদের আচরণের সমালোচনা করে বললেন — মানুষকে কাছে টানতে হবে। আচরণ বদলানোর উপদেশ দিলেন। জমায়েত কম হওয়ার জন্য উষ্মা প্রকাশ করলেন। এ সম্পর্কে একটি কথাই খাটে "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।" নেতাদের আচরণ অহঙ্কারী বিলাস-বৈভবপূর্ণ। খালি তলার কর্মীদের উপদেশ বাণী দিয়ে তিরস্কার কর। ধন্য নেতৃত্ব— ধিক তোমাদের প্রপঞ্চ কতা।

সি পি এম অনুগামী যুব ছাত্রদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার অধঃপতন দেখা দিয়েছে — এটা সম্মেলনে স্বীকৃত। কিন্তু কেন এই অবক্ষয়? নেতাদের দেখেই এটা হয়েছে। কোনও নেতার বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করা সত্ত্বেও সেই নেতা-নেতৃত্বের সিংহাসনে এখন আরূঢ়। এ সংবাদ আমার "আজকাল" পত্রিকা থেকেই পেয়েছি। নেতারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র পরিজন গোষ্ঠীকে সম্পদে বৈভবে ভরিয়ে দেন। সুভাষ চক্রবর্তী কি বলেন? তিনি বাড়ি গিফট পেয়েছেন? তিনখানি গাড়ির মালিক? বাড়িটা সারাতে কয়েক লক্ষ টাকা নাকি খরচ হয়েছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে সোমেন মিত্রের গোপন বৈঠক হয়। কলকাতা পুরসভার

> **"যুব সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর নীতির তীব্র সমালোচনা উঠেছে। ব্যাপক যুবকর্মীরা "বুদ্ধ নিরুপম হঠাও পার্টি বাঁচাও, সুভাষ হঠাও শৃঙ্খলা ফেরাও" স্লোগান তুলেছেন।"**

বিরোধী নেতা প্রদীপ ঘোষ থেকে নকশালী তৃণমূলী নেতা অসীম চ্যাটার্জি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখেন। এই আদর্শেই তো উত্তর ২৪ পরগণার যুব কর্মীরা শিক্ষিত হচ্ছেন? এর ফলেই তো বয়সের দোহাই দিয়ে উত্তর ২৪ পরগণার যুব নেতা জনৈক দাশ-কে রাজ্য যুব নেতৃত্ব থেকে ছেঁটে ফেলা হল।

বুদ্ধবাবুরা শুনে রাখুন, আপনাদের আচরণে দীক্ষিত শিক্ষিত যুব কর্মীদের ব্যবহারে মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে বিরোধী শিবিরে চলে যাচ্ছেন এবং যাবেন। সময় থাকতে সমঝে চলুন। তা নইলে শেষের সেদিন হবে ভয়ঙ্কর।

বুদ্ধবাবু আপনি ১৯৬৯-তে কলকাতার যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যেটা ২ অক্টোবর ৬৯ পাথুরিয়া-ঘাটার বিনানী বিদ্যালয়ে হয়েছিল। যেখানে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন নামটি ঠিক হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি এবং সুধাংশু পালিত। উদ্ধত সুধাংশুবাবু পরে বিতাড়িত হন। তাই এ-সম্মেলনের কথা পার্টি মানে না। একথা আমায় জানাচ্ছেন উত্তর কলকাতা জনৈক সাহা (বুদ্ধ বাবুর বন্ধু), জনৈক বসু ও জনৈক দত্ত।

যুবকর্মীদের নেতারা গোষ্ঠীবাজি করে পোক্ত করছেন। রাজ্যস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক-এর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছেন বিতর্কিত শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। রাজ্য নেতৃত্বে বর্ধমান গোষ্ঠীর প্রাধান্য। তাই রাজ্য-যুব সংগঠনেও বর্ধমান গোষ্ঠীর ক্ষমতা অটুট।

এর পাল্টা হিসাবে বুদ্ধদেব বাবু তাঁদের পারিবারিক সহচর মহঃ সেলিম-কে নিয়ে পাল্টা গোষ্ঠী করছেন। মদত পাচ্ছেন প্রকাশ কারাতের। তৃতীয় গোষ্ঠী তৈরিতে সচেষ্ট রাজ্য পার্টির সম্পাদক বিমান বসু-গৌতম দেব। জ্যোতিবাবু চান গৌতম দেবের উত্থান।

যুব সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর নীতির তীব্র সমালোচনা উঠেছে। ব্যাপক যুবকর্মীরা "বুদ্ধ নিরুপম হঠাও পার্টি বাঁচাও, সুভাষ হঠাও শৃঙ্খলা ফেরাও" স্লোগান তুলেছেন। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে?'

কলকাতা পার্টিতে রঘুনাথ কুশারীর বিরুদ্ধে নিরঞ্জন চ্যাটার্জিকে এক গোষ্ঠী তুলছে। এঁদের মধ্যে সক্রিয় প্রয়াত চিত্তব্রত মজুমদার-এর প্রয়াত ভ্রাতা দেবব্রত মজুমদারের পুত্র কল্লোল মজুমদার এবং দিলীপ সেন। রবীন দেব কোণঠাসা হয়েছেন। বালিগঞ্জের কর্মীরা রবীন দেবকে পছন্দ করেন না।

উত্তর ২৪ পরগণায় সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে রণজিৎ মিত্র দ্রুত গতিতে গোষ্ঠী গড়ে তুলছেন। তিনি বর্ধমান গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রেজ্জাক মোল্লা তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম করে নতুন গোষ্ঠী গড়তে চলেছেন। নেতৃত্ব থেকে অপসৃত মাস্টারমশাই প্রণব সেনও চুপ করে বসে থাকবেন কি? কান্তি গাঙ্গুলি তো বুদ্ধং শরণং, গচ্ছামি।

সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি মামলা হতে চলেছে। পেট্রলজাত দ্রব্যের মূল্য কমলেও ভাড়া কমবে না — ঘোষণা মালিক-ঘেঁষা পরিবহন মন্ত্রীর। তিনি বলেছেন, আরও একদফা তেলের দাম কমলে ভাড়া কমানোর কথা ভেবে দেখা যাবে। ভোটের সময়েও নির্বাচকমণ্ডলী জেতানোর কথাও ভেবে দেখবেন।

যুব-কর্মীদের একাংশের দাবি পার্টি নেতৃত্বের ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। নতুবা পার্টি আরও পিছিয়ে যাবে। বর্ধমান গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় কমিটির নব-নির্বাচিত সদস্য মদন ঘোষকে বসুর ছায়াসঙ্গী করে পরবর্তী রাজ্য সম্পাদক ঠিক করে ফেলেছে। দেখা যাক, বর্ধমান গোষ্ঠী জেতে কি না? তবে ময়লা যায় না ধুলে। স্বভাব যায় না মলে।

অন্য রকম

পিতৃপুরুষের টানে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আজমীরের ডিভিশনাল রেলওয়ে অফিসে চিঠি এসে পৌঁছাল। এসেছিল মুম্বাই-এর হেড অফিস থেকে। চিঠি হাতে পেলেন ডিভিশনাল ম্যানেজার রবীন্দ্র ট্যান্ডন। চিঠি খুলতেই চমকে উঠলেন। নিজের মনেই বিড় বিড় করতে লাগলেন — একী! এত বছর পর! এসবের কী দরকার! চিঠিটা সত্যই অবাক করে। এক বৃটিশ কর্মীর বৃত্তান্ত জানতে চেয়ে চিঠি। পত্রের প্রেরক ভারতীয় নন। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। একজন ব্যবসায়ী। নাম ও'হারা। ও'হারার দাদুই ওই বৃটিশ কর্মী। আলেজান্ডার ক্লাউড। তাঁর সম্বন্ধে জানতে চেয়েই চিঠি পাঠিয়েছেন ও'হারা।

আলেকজান্ডার একসময় ভারতে চাকরি করতেন। তখন বৃটিশ শাসন। ভারতে প্রথম রেল ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রেলদপ্তরেই চাকরি করতেন আলেকজান্ডার। রাজপুতানায় ছিল অফিস। ও হারা এসব জানে না। দাদুকে সে চোখে দেখেনি। ছোটো অবস্থায় তাঁকে হারিয়েছে। মা'র মুখে দাদুর অনেক কথা শুনেছেন। জেনেছেন দাদু ক্ল্যারিকাল পদে চাকরি করতেন।

আলেকজান্ডার বরাবরই ক্ষীণকায়। রোগ-ভোগ লেগেই থাকত। তবুও ঠিকঠাক চলছিল। একদিন ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ৩৫-র গোড়াতেই মারা যান তিনি। অসহায় স্ত্রী পুত্র পাড়ি দেন ইংল্যান্ড। তারপরে অস্ট্রেলিয়া। এখানেই বড় হন হারা। হারার বয়সও কম হয়নি। প্রায় ৮০। তিনি দাদু আলেজান্ডার সম্বন্ধে জানতে চান। তিনিও দেখে যেতে চান ভারতবর্ষকে। সময়মতো হাজির হলেন হারা। ঘুরতে নয়, পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে জানতে। তাঁর কাছে তাঁর পিতৃপুরুষ দেবতুল্য। তাদেরকে জানাই যেন তীর্থ ভ্রমন। হারা নিজেও সে কথা স্বীকার করেন।

ট্যান্ডন হারাকে আহ্বান জানালেন। নিয়ে গেলেন একেবারে নিজের বাস গৃহে। দেখালেন তাঁর দাদুর বিভিন্ন ছবি। অ্যালবাম দেখতে দেখতে চোখ ছল ছল করে উঠল হারার। রেলের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন দাদুর অফিস। সংগ্রহ করলেন দাদুর বহু ছবি। পরিত্যক্ত জিনিসপত্র। বয়সের চাপে থমকে গেলেন না। এত বছর পরেও দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান দেখে অবাক হলেন অনেকে। অনেকে এনিয়ে প্রশ্নও করলেন তাঁকে। হারার উত্তর— 'দেরি হয়েছে ঠিক, কিন্তু এসেছি তো। বয়স আমার অনেক। তাই মরার অগে একবার দাদুকে জেনে যাব না!'

হারা-র অনুভব দাদু ভারতে সুখেই ছিলেন। পরাধীন ভারত তখন। কিন্তু অসুবিধা হয়নি তাঁর। তাঁর সহকর্মীরাও ভালো ছিলেন। দাদুকে চোখে দেখেননি তিনি। তবে হারা ভারতবর্ষের মাঝে দাদুকে খুঁজে পেয়েছেন। অনুভব করেছেন আজও দাদু ভারতবর্ষে আছেন। এখানকার মাটি, বাতাস জলে হারা দাদুর স্পর্শ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি খুশী। গর্বিত ভারতবর্ষের প্রতি।

ও'হারাকে তাঁর দাদুর ছবি দেখাচ্ছেন শ্রীট্যাণ্ড ন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই ৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করছে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গোয়েন্দা রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তরগুলি নেপাল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লাগোয়া রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার আনুপাতিক পরিবর্তন বিষয়ে একটি সতর্ক সমীক্ষা চালায়। গোয়েন্দা আধিকারিকদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সমগ্র সীমান্ত অঞ্চ ল বরাবর প্রচুর নতুন নতুন মাদ্রাসা এবং মসজিদ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা থেকেই পুরো এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গি ত মিলছে।

২০০১ সালের আদমসুমারিকে ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণে তাদের কাছে স্পষ্ট একটি রাজনৈতিক প্রবণতা ধরা পড়েছে। নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে সংখ্যালঘু তোষণকে বিজেপি সামনে রেখে যে ব্যাপক রাজনৈতিক আবেগ ও আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাধুনিক পরিসংখ্যান ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চ লগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি র আনুপাতিক হার — বিশেষত বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের কথা মাথায় রেখে অবস্থার মোকাবিলা করতে এই সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষের পথে।

এই ইস্যুতে সরকার সর্বশেষ পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে চলেছে। সরকারি আধিকারিকদের ধারণা আগামী নির্বাচনে জাতীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বিজেপি পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই বিষয় নিয়ে সর্বশেষ ১৯৯২-তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি সমীক্ষা করেছিল। কিন্তু সেই রিপোর্ট এতই বিস্ফোরক এবং সংবেদনশীল ছিল যে তা একেবারে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে যায়। বেআইনি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দেড় থেকে দু'কোটির মতো চাঞ্চ ল্যকর তথ্যটি বেরিয়ে পড়েছিল। বারবার গোয়েন্দাসূত্রগুলো খবর দিয়ে চলেছিল যে সন্ত্রাসবাদীরা মাদ্রাসা এবং মসজিদগুলোতে মারাত্মক অস্ত্র সম্ভার জমায়েতসহ লুকোবার সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করছে।

সংবাদসূত্র মতে নেপাল, নিম্ন অসম এবং পশ্চি মবাংলার সীমান্ত এলাকায় সব চাইতে বেশি সংখ্যায় মাদ্রাসা এবং মসজিদ গজিয়ে উঠেছে। গোপন এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ,পশ্চি মবাংলায় সীমান্ত জেলাগুলোর ৪০ শতাংশ গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে চাঞ্চ ল্যকর খবর হল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এবং মুসলিম জনসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ক্রমশ শহর এলাকার দিকে সরে যাচ্ছে। গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা মসজিদসহ দেখা যায় যে ভারত ও নেপাল সীমান্ত বরাবর বিরাট সংখ্যক বেসরকারি মুসলমান (এনজিও) সংগঠন অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া সপতরি এবং সুন্দরীতে সব থেকে বেশি সংখ্যক এনজিও অত্যন্ত সক্রিয়। এছাড়াও নেপালের সিরাহা ধনুশা এবং কপিলাবস্তুতে বহু মাদ্রাসা চালু হয়েছে রাতারাতি। অধিকাংশ মাদ্রাসাই পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসীদের ভারত বিরোধী কাজ কর্মে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে। এনজিওগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারসহ জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের ভান করে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসের আখড়া বানাতে তৎপর হয়েছে। এ ব্যাপারে সৌদি আরব, কুয়েত, লিবিয়াসহ অন্য মুসলিম রাষ্ট্ররা অঢেল টাকার জোগান দিয়ে চলেছে।

এই এনজিও-গুলি নেপালের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে বলছে যে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী কোচবিহার, দঃ দিনাজপুর মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দুই চব্বিশ পরগণায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি র হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-কারীরাই এখন ৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজ্যে সিপিএমের হারানো জমি ফিরে পেতে যুব সংগঠনকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ঃ ইসলামপুর ।। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই-এর চতুর্দশ জেলা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে হিংসা রাজনীতির ডাক দিলেন নেতারা। যুব সংগঠনকে দিয়ে জনজাতি আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে নেওয়ার গেমপ্ল্যানও তৈরি করেছে সি পি এম।

জনজাতিদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ডি ওয়াই এফ আই-এর সদস্যদের সক্রিয় হতে বলা হয়েছে। এমনকী ওই গেমপ্ল্যান-এর বিভিন্ন কৌশলকে বাস্তব রূপ দিতে ডি ওয়াই এফ আই সদস্যদের রীতিমতো শপথ গ্রহণ করতে বলা হয়। এছাড়া ডি ওয়াই এফআই-এর চতুর্দশ উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এসব কথা বলার পাশাপাশি চা-বাগানে কর্মরত যুবকদেরও সংগঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

ডি ওয়াই এফ আই-এর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ২৪ নং পাতায় বলা হয়েছে যে, এই জেলা জনজাতি আন্দোলন থেকে মুক্ত নয়। প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। জেলায় জনজাতিদের মধ্যে প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে জনজাতি টিম তৈরি করতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে জেলায় হুল উৎসব পালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যুব সংগঠনের মাধ্যমে উৎসবগুলি সংগঠিত করতে হবে।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, যুব সংগঠনকে দিয়ে জনজাতি আন্দোলন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার উদ্যোগেই সি পি এম এই কৌশল নিয়েছে। সি পি এম ধর্মীয় উৎসবের ঘোর বিরোধী, অথচ আজ বিপাকে পড়ে হুল উৎসবের আয়োজন করতেও তাদের কোনও আপত্তি নেই।

এদিকে সাঁওতাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা সালভা সিংহ এবং সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক ফিলিপ মুর্মু বলেন, বঞ্চি ত ও অত্যাচারিত জনজাতিদের মাওবাদী তকমা সেঁটে হয়রান করা হচ্ছে। তার উপর চলছে জনজাতি সমাজে পার্টিতন্ত্র চালিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস। এ জেলার রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সি পি এম হারানো জমি ফিরে পেতে যুব সংগঠনকে উস্‌কে দিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করার কৌশল নিয়েছে। এতে রাজ্য জুড়ে হানাহানি আরও বাড়বে বৈ কমবে না।

এদিকে তথ্যাভিজ্ঞমহল অভিমত প্রকাশ করেছে যে, অন্য সব কিছুতে যতই পিছিয়ে থাক, এ রাজ্য অন্তত রাজনৈতিক সন্ত্রাসে যে শীর্ষে আছে সেটা সম্প্রতি এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান হিউম্যান রাইটস্ ২০০৮ সালের রিপোর্টেই উঠে এসেছে। এই রিপোর্টে এ রাজ্যের ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও বিরোধীদলগুলির ওপর দমন পীড়নের ঘটনা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে কীভাবে পশ্চি মবঙ্গ রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

মোদীর উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নজর কেড়েছে সারা দেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ্ব জুড়ে খনিজ তেলের সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক হারে খনিজ তেল এবং বিকল্প তেল উৎপাদনের উদ্যোগ নিল গুজরাট সরকার। সরকারি তথ্য অনুসারে, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চ লে একর প্রতি বাৎসরিক ১৯ হাজার লিটার তেল উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

উল্লেখ্য খনিজ তেল তথা যানবাহন চালানোর ডিজেল নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক টানা-পোড়েন শুরু হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি আজ অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এই তেলের উপর। 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট'-এর বিশেষ দল এ ব্যাপারে নজর দিয়ে খনিজ তেল এবং বায়ো-ডিজেল উৎপাদনের দিকে নজর দিয়েছে। তাদের পরিকল্পনা অনুসারেও সৌরাষ্ট্র কচ্ছের সাগরপার ধরে ১৫ শো কিলোমিটার অঞ্চ লকে খনিজ তেল উৎঘাটনের বিশেষ অঞ্চ ল হিসেবে চিহ্নিত করেছে সরকার এবং তার জন্য 'সেল' নামক এক বিশেষ কোম্পানীকে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বায়োডিজেল উৎপাদনের ব্যাপক লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও ওই বিশেষ দল প্রয়াস চালাচ্ছে।

গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেডের সূত্র অনুযায়ী, বৈদ্যুতিকরণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য গুজরাটকে চয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য গুজরাটের গ্রামীণ ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ

সরবরাহ করার মতো পরিস্থিতি তৈরিতে সক্ষম হয়ে উঠেছে গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড। এর ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চ লেও সাধারণ মানুষ জীবন-যাত্রার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে কাজে লাগাচ্ছে। এদিকে উৎপাদিত তেলের বাজারজাত এবং ব্যবহারের সঠিক দিকগুলি নিয়েও ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করে দিয়েছে সরকার। এমনকী এই প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন কার্বন-ডাই অক্সাইড বা তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুকে কীভাবে অন্য কাজে লাগানো যায় যাতে সে দিকেও নজর দিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

মধুখালিতে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা উত্তেজনা

সংবাদদাতা মধুখালি (ফরিদপুর)।। এক শ্রেণীর মুসলিম দুষ্কৃতী উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের কারণ্যপুর গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দির থেকে ৩টি দেবমূর্তি বের করে রাস্তার ওপর ভাঙচুর করে। গত ২৩ ডিসেম্বর গভীর রাতের এই ঘটনায় জাহাপুর ইউনিয়ন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি গুরুদাস চক্রবর্তী মধুখালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। এ নিয়ে নির্বাচনের আগে সংশিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মধুখালি থানা পুলিশ কোনও অপরাধীকে শনাক্ত বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি। মধুখালি উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিমা ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়। ঘটনার পর পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

অশনি সংকেত

সংবাদদাতা।। শিল্পোন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির নামে সিপিএম যেভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে বাংলার মাটিতে আবাহন করছে তা আখেরে ঘোর বিপর্যয়ের কারণ হবে বলে বামপন্থীদের একাংশের অভিমত। তাদের মতে, একসময় বামপন্থীরা যেভাবে টাটা বিড়লাদের গালি দিত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল, আজকের আচরণ একেবারে তার বিপরীত। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের এই শিল্পের স্লোগান রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে অশনি সংকেত বলে একশ্রেণীর বুদ্ধি জীবীরও অভিমত।

রমণ সিং-এর পথেই মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলা চাইছে ওড়িশা সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলায় ওড়িশা সরকারও জনজাতিদের দ্বারস্থ। সরকার একাজে মাঝবয়সী জনজাতি যুবক-যুবতীদের মাঠে নামাচ্ছে। সরকারি সূত্র অনুসারে মাওবাদী মোকাবিলায় তাদেরকেই 'স্পেশাল পুলিশ অফিসার' পদে নিয়োগ করা হবে। মূলত মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই তারা কাজ করবে। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের এই পদে নিযুক্ত করা হবে বলে জানা গেছে। তিন বছরের চুক্তিতে তাদের নিয়োগ হবে। এজন্য প্রথম দু'বছর ৪ হাজার ও পরের ১ বছর সাড়ে ৪ হাজার টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হবে। জনজাতি যুবক-যুবতীরা শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ হওয়ায়, সরকারও মাওবাদী মোকাবিলায় তাদেরকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। উত্তর-পশ্চি ম জোনের ডি আই জি সঞ্জীব পান্ডের মতে, 'জনজাতি ছেলে-মেয়েরা স্থানীয় ভাষায় অভিজ্ঞ। ফলে একাজে তারাই আমাদের বেশি সহায়ক।' মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াইও যে তারা পুলিশকে বেশি মদত যোগাবে সে বিষয়েও শ্রীপান্ডে আশাবাদী। স্পেশাল পুলিশ অফিসার হিসাবে তাদের নিয়োগ সরকারি নিয়ম মাফিকই করা হচ্ছে। এই পদের জন্য প্রশাসনের দিক থেকে বিজ্ঞাপন জারি করা হয়। ওই বিজ্ঞাপনেই স্থানীয় যুবক-যুবতীদের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আবেদনকারীদের শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাওবাদীদের মোকাবিলায় স্পেশাল পুলিশ অফিসার।

নবীন পট্টনায়ক সরকারের এই উদ্যোগ নিয়েও ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অনেকে এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের (ছত্তিশগড়) সালয়া জুডুমের গন্ধ পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, ছত্তিশগড় সরকার রমণ সিং মাওবাদী নিয়ন্ত্রণে সালয়া জুডুম ২০০৫ সালে তৈরি করেন। সেসময় রমণ সরকারের রাজ্যেও এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। কিন্তু তিনি সব বিতর্কের মুখে ঝামা ঘষে দেখিয়ে দিয়েছেন মাওবাদী মোকাবিলায় তিনি অনেকটাই সফল। তবে ওড়িশা প্রশাসন একে কিছুতেই সালয়া জুডুমের মতো বলতে রাজি নয়।

ওড়িশার ডি জি মনমোহন প্রহারাজ বিতর্কের অবসানের জন্য স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, 'এটি কোনও দ্বিতীয় সালয়া জুডুম নয়'।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি সূত্র অনুসারে, ওড়িশায় মাওবাদী সমস্যা গত কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়েছে। ২০০৫ সালেই মাওবাদীরা ৩৭ টি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটায়। যার বলি হতে হয় ২১ জন সাধারণ মানুষসহ ৬ জন বামপন্থী সমর্থক। ২০০৬-এ এঘটনা আরও বৃদ্ধি পায়। এবছর ৪৩টি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় ২৮ জন সাধারণ মানুষ সহ ২০ জন বামফ্রন্ট সমর্থক প্রাণ হারায়। ২০০৭ সালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এবছরও মাওবাদীরা ৫২টি স্থানে হামলা চালায়। যার শিকার হয় ২২ জন নিরীহ মানুষ। ২০০৮-এ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। এবছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাওবাদীদের বিভিন্ন ২১টি হামলায় ৩২ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

বছরের পর বছর মাওবাদীদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকারের ভরসা বলতে তাই এখন এই জনজাতিরাই। সরকার তাদেরকে এইপদে নিয়োগ করে মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলায় সক্রিয় হতে চাইছে। প্রশাসনও একারণেই জনজাতি যুবক যুবতীদের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাতেই পাঠাতে চাইছে। ওড়িশার প্রশাসন একাজে প্রাথমিকভাবে ২০০০ যুবক-যুবতীকে ৫টি মাওবাদী অধ্যুষিত জেলায় পাঠাচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে মালকানগিরি, কোরাপুট, গজপতি, রায়গড় ও কন্ধমাল।

এই সমস্ত এলাকা ছাড়াও স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের আগামী দিনে সম্বলপুর, ডিওগ্রা, নায়াগ্রাসহ মোট ১৪টি মাওবাদী কবলিত জেলাতে পাঠানো হবে। এই কাজ যাতে কোনও নতুন বিতর্ক তৈরি না করে, তার জন্য ওড়িশার স্থানীয় প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়। জনজাতিদের সাহায্য করতে তারা নিজেরাও অনেকটা আগ্রহী বলেও জানিয়েছেন এক পুলিশ কর্মী। সালয়া জুডুম না হলেও রমণ সিং-এর দেখানো পথ যে মাওবাদী মোকাবিলায় ভালো দাবাই হতে পারে এবিষয়ে অনেকেই আশাবাদী। বিশেষজ্ঞমহলও এই উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দুর্গে হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ছত্তিশগড় সম্ভবত প্রথম রাজ্য যেখানে মাওবাদীরা মুক্তাঞ্চ ল গঠন করেছিল। তারা হাজার হাজার জনজাতি বনবাসীদের উপর চরম অত্যাচার করে সরকারি ত্রাণশিবিরে পাঠিয়েছিল। এবার কেন্দ্র সরকারের সহায়তায় সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যোগাযোগের উপকরণ আর প্রশিক্ষণে গর্বিত দশ হাজারের কোবরা কমব্যাট ব্যাটেলিয়ন এবার মাওবাদী দুর্গে আঘাত হানল।

তারা মাওবাদী দুর্গ বলে কথিত কাঁকের, বিজাপুর এবং নারায়ণপুরেও ঢুকে পড়ল। সি আর পি এফ-এর কাছ থেকে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিটার, স্যাটেলাইট ফোন ধার নেওয়া হয়েছে। এসব সাফল্যের কথা জানিয়েছেন আই জি (হেডকোয়ার্টার) কে দুর্গাপ্রসাদ। তিনিই এই নকশাল বিরোধী বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হলেও বাহিনী এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি।

ফোর্সের একজন প্রমুখ অফিসার জানিয়েছেন, ছত্তিশগড়ের এই কোবরা ফোর্সের রীতিমতো কমান্ডো ট্রেনিং হয়েছে। ভি আই পি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের উপর মাওবাদীরা নিয়মিতভাবে যে আক্রমণ চালাচ্ছে তা মোকাবিলা করবে কমান্ডোরা। এই বাহিনীতে ৮টি ব্যাটেলিয়ন রয়েছে। হাতে রয়েছে ঊনিশ রকমের অস্ত্রশস্ত্র। রয়েছে মাইন নিরোধক গাড়ি। এছাড়া গ্রেনেড লঞ্চ ার, কম ওজনের এম পি ৫এ অটোমেটিক রাইফেল। দশ হাজারের এই বাহিনীর হাতে দেওয়া হয়েছে মাইন ডিটেক্টর, এক্সপ্লোসিভ ডিটেক্টর, হাল্কা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট।

'গুজরাট জ্ঞান সংগঠন'

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নে মোদীর চমকপ্রদ পদক্ষেপ

সংবাদদাতা ।। শুধু বৈষয়িক উন্নতি নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও এবার উন্নয়নের এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটালেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাট সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সুত্র অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই রাজ্যের প্রধান কয়েকটি শহরে স্থাপিত হবে ''গুজরাট জ্ঞান সংগঠন''। তার সমস্ত প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী।

সরকারি সূত্র অনুসারে, এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী সাফল্যের শীর্ষে অবস্থানকারী গুজরাটিদের নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকগুলির অত্যাধুনিক উন্নয়নের জন্য এক একটি দিক উন্মোচিত হবে। প্রাথমিকভাবে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে এর প্রধান অফিস নির্মাণ হচ্ছে। এরপর বিভিন্ন দেশের সফল গুজরাটিদের প্রাথমিক তালিকা এবং তাদের বিষয়ে অবহিত করার কাজও সম্পন্ন হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং মূল সঞ্চ ালক দলের সঙ্গে আলোচনা করে, পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক বোঝাপড়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য, গত কয়েক বছর যাবৎ গুজরাটের রাস্তা-ঘাট, জল, বিদ্যুৎ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে গুজরাটের সার্বিক উন্নয়ণের জন্য 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট' নামে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে গুজরাট সরকার। 'গুজরাট জ্ঞান সংগঠন' সেই পরিকল্পনারই এক দিক। যার মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, নির্মাণশাস্ত্র থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত দিককে উৎকর্ষতার চরমে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করা হবে।

এই জ্ঞান সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্য যাতে শীঘ্রাতিশীঘ্র কার্যকর হয় অর্থাৎ ফলিত প্রয়োগের স্বার্থেও একটি দশ পনেরো

জনের বিশেষজ্ঞদের টিম গঠন করা হয়েছে। যারা বাণিজ্য জগৎ বা কর্পোরেট ক্ষেত্রে এর সাফল্যকে সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে। এমনকী এই পরিকল্পনা এবং তার সাফল্য যাতে রাজ্যব্যাপী হতে পারে তার জন্য প্রমুখ শহরগুলি থেকে সমস্ত রাজ্যকে সঞ্চ ালনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উঠে আসার সুযোগ পায় এবং তা উপযুক্ত চর্চা তথা অনুশীলনের সাথে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ যেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে সেই গান্ধী নগরের এক আই এ এস অফিসারের বক্তব্য, এই পরিকল্পনা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুধু গুজরাট নয়, ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলো এর লাভ পাবে। এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশা-প্রকাশ করেন। তাঁর স্পষ্ট মত দেশের মধ্যে এই ধরনের উদ্যোগ একেবারে প্রথম।

উন্নত গবেষণার জন্য অত্যাধুনিক গবেষণাগার নির্মাণ হচ্ছে এই পরিকল্পনায়, যা রীতিমতো প্রথম সারির শিল্পন্নোত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবে। প্রবাসী গুজরাটিরা স্বল্প সময়, দীর্ঘ সময়ের যোজনায় এই প্রকল্পতে যাতে যোগদান করতে পারে তার জন্য যাতায়াত এবং থাকা খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও এর জন্য আরও যা যা প্রয়োজন তা আবশ্যকতা অনুসারে করা হচ্ছে বলে এই প্রকল্পের এক জুনিয়র অফিসার জানান।

কোচবিহারে লুপ্তপ্রায় মেখলি শিল্প

অবহেলিত উত্তরবঙ্গ

নবকুমার ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি জেলা উত্তরবঙ্গে। এককালে উত্তর বাংলার সমতলভূমির মূল জনগোষ্ঠী ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়। চা বাগিচার পত্তন ও দেশ বিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ ছিন্নমূল আগত বাঙালি উদ্বাস্তুর স্রোতে এই রাজবংশীরা আজ নিজভূমেই সংখ্যালঘু। আজকের শিলিগুড়ি কলেজ যে বিশাল জমির উপর গড়ে উঠেছে সেই জমিটা দান করেছিলেন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের অতি শ্রদ্ধেয় মানুষ বীরেন রায় সরকার। অথচ এই দানবীর বীরেন রায় সরকারের এই দানকে স্বীকৃতি জানাতে তাঁর নামে একটা ফলকও শিলিগুড়ি কলেজের কোনও কোণেই জায়গা পায়নি। আজকের শিলিগুড়ি যখন মিত্তাল ভট্টাচার্য আগরওয়ালাদের শিলিগুড়ি ছিল না, তখন তা ছিল এখানকার ভূমিপুত্রদের হাতে। আজকের শিলিগুড়ির অভিজাত কলেজ পাড়ার নাম ছিল এখানকার ভূমিপুত্র কালিপ্রসন্ন জোতের নামে। দেশবন্ধু পাড়ার নাম ছিল রাজ রাজেশ্বরী জোত, হাকিমপাড়ার নাম ছিল ব্রজ সিং জোত, ভারতনগরের নাম যোগেন জোত। সবাই ভূমিপুত্র রাজবংশী। এদের সব পরিচয় আজ শিলিগুড়ি থেকে মুছে গেছে। নিজ জন্মভূমিতেই উচ্ছেদ অথবা পরবাসের যন্ত্রণা নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, তার খোঁজ করার যে প্রয়োজন ছিল তা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠরা ভাবতে চাননি। অথচ অনেকেরই জানা নেই একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই ১৫১টি ভাষা রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি বিদেশি ভাষা, ৪২টি ভাষার এখনও বর্গীকরণ করা যায়নি। বাকি ১০১টি ভাষার মধ্যে ৪৬টি ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠী এবং ১২টি ভোট চীনা ভাষা গোষ্ঠী, ১৯টি আস্টিক ভাষা গোষ্ঠী এবং ১২টি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী। একটা জেলার এমন ভাষাগত তথা জাতি গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য যে শুধুমাত্র প্রথাগত নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন এখানকার মাটির স্পন্দনকে অনুভব করার সংবেদনশীল মন। যা রাজনৈতিক শাসনের বাঁধনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উত্তরবঙ্গ আজও ঔপনিবেশিক মানসিকতার মতো এক কাঁচামাল সরবরাহ কেন্দ্র। চা উত্তরবাংলায় উৎপন্ন হবে, অথচ টি ট্রেডিং কর্পোরেশন ও চা নীলাম কেন্দ্রের প্রধান কেন্দ্র হবে কলকাতা। উত্তর বাংলার বনভূমি নিধন হবে অথচ শালের স্লিপার পাতা হবে ভিন্ন অঞ্চলে, এলিফেন্টা ঘাস সমগ্র উত্তরবঙ্গ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে অন্য জেলার কাগজ শিল্পে।

সারণি-১

জেলা	মানব উন্নয়নসূচক	স্বাস্থ্যসূচক	আয়সূচক	শিক্ষাসূচক
পশ্চিমবঙ্গের গড়	০.৬১	০.৭০	০.৪৩	০.৬৯
দার্জিলিং	০.৬৫	০.৭৩	০.৪৯	০.৭২
জলপাইগুড়ি	০.৫৩	০.৬১	০.৩৮	০.৬০
কোচবিহার	০.৫২	০.৫০	০.৪১	০.৬৪
দিনাজপুর (উঃ ও দঃ)	০.৫১	০.৬২	০.৩৯	০.৫৩
মালদহ	০.৪৪	০.৪৯	০.৩৬	০.৪৮

সারণি-২

বসত বাড়ির হালহকিকত (মোট পরিবারের শতাংশ হিসেবে)

	গৃহহীন	কাঁচা বাড়ি	আধ পাকা বাড়ি	পাকা বাড়ি	শহুরে বাড়ি	মোটপরিবার সংখ্যা
উত্তরবঙ্গ	১০.৬৯	৬৫.৪০	১৫.৪৭	৭.২৭	১.৬৯	১১৩১৫৩৪
দক্ষিণবঙ্গ	৯.২৮	৬৯.৮৭	১০.০০	৮.৭২	২.১০	২৭৯৩১৪৯

পরিষেবা ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের স্থান শোচনীয়। সরকারি রিপোর্টেই উল্লেখিত হয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা এমনই সঙ্গীন যে এখানে শিল্পস্থাপন অসম্ভব। সেই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে রাস্তাঘাটের জঘন্য অবস্থার জন্য একই শিল্পদ্রব্য উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে উৎপন্ন হলে উত্তরবঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় অন্তত ৩০ শতাংশ। এখানে বলা দরকার মাথাপিছু রাস্তা রেললাইন উত্তরবঙ্গে এতই কম যে এখানে শিল্পস্থাপনার ভাবনা স্বাধীনতার এত বছর পরেও হয়নি। তাই ৯৭ শতাংশ শিল্প-শ্রমিক দক্ষিণবঙ্গে, আর ৩ শতাংশ উত্তরবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প নিয়ে এত লাফালাফি করলেও ৩১ বছর উত্তরবঙ্গ শিল্পবিহীন রইল কেন? প্রশ্ন ওঠা শুরু করছে, উত্তর বাংলা যখন শিল্পে এত পিছিয়ে তখন ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তর বাংলার জন্য রাজ্যের মোট বিনিয়োগের ৯ শতাংশ মাত্র বরাদ্দ হবে কেন?

দক্ষিণবঙ্গে যখন প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১৯০৬ জন শিল্পে যুক্ত হবার সুযোগ পায় সেখানে উত্তরবঙ্গে এই সংখ্যা মাত্র ৩৪৯ জন কেন? জনসংখ্যার বিচারে উত্তরবাংলার জনসংখ্যা সমগ্র রাজ্যের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হলেও সম্পদ বন্টনের প্রশ্নে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বৈষম্য কেন? উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের অবস্থা শোচনীয়। যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদনে উত্তরবঙ্গ প্রায় স্বয়ম্ভর, তথাপি উত্তরবঙ্গে ঘাটতি বিদ্যুতের। এই ঘাটতি সাঙ্ঘাতিক মাত্রায়। আপাতত পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ যা খরচ হয় তার ৯০ শতাংশ দক্ষিণবঙ্গে আর ৭ শতাংশ উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায়। পশ্চিমবঙ্গের ২০ শতাংশ লোক উত্তরবঙ্গে থাকলেও এখানে গ্রামীণ বিদ্যুৎ অধরা। রাজ্য সরকার প্রকাশিত HDRCC, Development and Planning Department, Govt of W.B. প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রোফাইলস ২০০৭ পশ্চিমবঙ্গ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা যথেষ্ট বিপদসঙ্কেত দিচ্ছে। বত্রিশ বছর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন, তবুও নির্মম অর্থনৈতিক বৈষম্য কার্যত সমাজকে ভাগ করে রেখেছে। সরকারি তথ্য বলছে — কলকাতার ধারে কাছে উন্নয়ন বেশি, যত দূরে যাওয়া যাবে উন্নয়ন কম, অনগ্রসরতা ব্যাপক।

সেচ ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি উত্তরবঙ্গে। তিস্তা প্রকল্প একটি খুড়োর কল। এই ব্যারেজ এখনও শেষ হয়নি। প্রায় তিরিশ বছর আগে শেষ করার কথা ছিল। কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়ে কলকাতায় লাফালাফি হচ্ছে অথচ উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওয়েবেল বা আই টি শিল্পের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন জলপাইগুড়িতে করা হয়েছিল। বামপন্থীরা চিৎকার করে বলেছিল ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা কলকাতার দমদমে চলে যায়। কোচবিহারে পাট শিল্প স্থাপনার জন্য ভিত্তি দু'দশক আগে হয়েছিল—ভিত্তি আছে। প্রস্তর আছে। তবে শিল্প নেই। দিনহাটায় চুরুট কারখানা করা হবে বলে মিছিল হয়েছিল। কিন্তু কারখানা হয়নি। ১৯৮৪ সালে জলপাইগুড়ির হলদিবাড়িতে ফল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের শিলান্যাস করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালে আলিপুরদুয়ারে ভেষজ উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। প্রতিশ্রুতির ভিড়ে সব হারিয়ে গেছে। বলা হয়েছিল মালদহে স্থাপিত হবে Integral Coach Factory, দার্জিলিং এ স্থাপিত হবে কাগজ কল — আজ সবাই ভুলে গেছে। নিউজলপাইগুড়ির রেল লাইন বৈদ্যুতি-করণের কথা ছিল, ট্রট্টগুরিপোর্টে দেখা গেছে সেই অর্থ বেঙ্গালুরুর একটি প্রকল্পে খরচ হয়েছে।

❝

এই শিল্পে বয়ন পদ্ধতি খুবই মজার। টাকুড়াস দিয়ে তৈরি পাটের সুতোকে একটি বা দুটি দোখোনা বা দোকোণা বা মাকুর মতো তৈরি যন্ত্রে ভরাতে হয়। তার পূর্বে প্রয়োজন অনুসারে রঙ করে নিতে হয়।

❞

সারণি-৩

দৈনন্দিন খাবারের নিশ্চয়তা (মোট পরিবারের শতাংশ হিসেবে)

	বছরের বেশিরভাগ সময় দিনে একবারও পেট ভরা খাবার না পাওয়া	বছরের বেশিরভাগ সময়ে দিনে একবার পেট ভরা খাবার পাওয়া	সারাবছর দিনে একবার পেট ভরা খাবার পাওয়া	প্রায় সারাবছর দিনে দুবার পেট ভরা খাবার পাওয়া কখন কখনও একবেলা উপোস	বছর ভর পর্যাপ্ত খাবার পাওয়া
উত্তরবঙ্গ	৫.৬০	২২.০০	৩৬.০৮	২৫.২৪	১১০৮
দক্ষিণবঙ্গ	৩.৮৬	১৩.৫১	২৯.৪৮	৩২.৫৫	২০.২৩

শিল্প উন্নয়ন নিগম, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যা রয়েছে তারা উত্তরবঙ্গে শিল্পস্থাপনায় যথেষ্ট আগ্রহী নন। আইনে রয়েছে ব্যাঙ্কের স্থানীয় ডিপোজিটের বৃহৎ অংশ স্থানীয় উন্নতিতে ব্যয় করতে হবে। উত্তরবঙ্গে 'ডিপোজিট লোন রেসিও' বর্তমানে যা, তাতে বলা যায় ব্যাঙ্কগুলি এখানকার ডিপোজিট উত্তরবঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যয় না করে অন্য অঞ্চলে বিনিয়োগ করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি পশ্চিমবাংলার শিক্ষার গড় হার থেকে অনেক পিছিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ানো হতো ৯৬টি বিষয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ছিল মাত্র ১৬টি বিষয়। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যা কিছু ভাবনা সব সমতলের জন্য। পাহাড়ের মানুষকে বলা হচ্ছে পাহাড়ের ভৌগোলিক পরিবেশে ওই ধরনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সম্ভব নয়। অথচ পাশের অতি ক্ষুদ্র রাজ্য সিকিমে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই রয়েছে। শহর থেকে দলে দলে ছাত্র সেখানে ভিড় করছে। স্বাভাবিক ভাবেই দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা ভাবছেন তাদেরও যদি সিকিমের মতো রাজ্য থাকত তাহলে এখানেও সব হতো। রাজবংশী মানুষেরা এই বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। একবার তারা জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন। এখন হারাতে বসেছেন তাঁদের পরিচয়ের চিহ্নগুলিকে।

সারণি-৪

পরিবারের প্রধান সদস্যের গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার কারণ (মোট পরিবারের শতাংশ হিসেবে)

	অনিয়মিত কাজের সুযোগ	মরসুমি কাজের সুযোগ	জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য সুযোগ	যাঁরা কখনই শহরে যাননি	অপেশাগত কারণে	মোট পরিবারের সংখ্যা
উত্তরবঙ্গ	৩৩.২১	২৮.২৮	৭.০৩	২.০১	২৯.৪৭	১১৩১৫৩৪
দক্ষিণবঙ্গ	৪২.০৯	২৭.১৯	৬.৭৮	১.৮২	২২.১২	২৭৯৩১৪৯

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে বেড়ে চলেছে মৃত শ্রমিকের মিছিল

দার্জিলিং পাহাড় ও জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১০টি বাগান নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ২০০২ মার্চের ক্যাগের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে — কোম্পানি দার্জিলিং জেলায় চারটি চা বাগান অধিগ্রহণ করলেও অপদার্থতার ফলে সেগুলিকে চাঙ্গা করতে চরম ব্যর্থ হয়। চা বাগান মালিকদের অপদার্থতা ও সরকারি সদিচ্ছার অভাবে চা বাগানগুলি আজ বন্ধের মুখে। মালিকশ্রেণী সুদীর্ঘকাল ধরে বাগান থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। এখন তারা বাগান বন্ধ করে, সেই জমিতে আবাসন বা রিসর্ট গড়তে চাইছেন।

পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫০০।....সরকারি মতে অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু বলা হলেও প্রশ্ন ওঠে, এই অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর ঘটনাগুলি হঠাৎ করে চা বাগানেই বা উঠে এল কোথা থেকে?

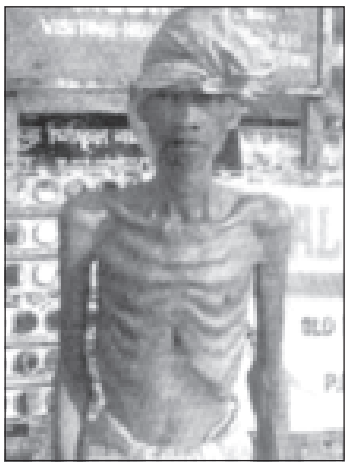

বিশেষ সংবাদদাতা ।। উত্তরবঙ্গের শিল্প বলতে একমাত্র চা শিল্প। এক সময়ের সোনা ফলা বাগানে আজ চা শ্রমিকের মৃত্যু মিছিল। এক নয়, দুই নয়, শত শত শ্রমিকের মৃত্যু মিছিল। বাগান বন্ধ, কাজ নেই — তাই অনাহারে মৃত্যু। বামফ্রন্ট সরকারের মতে অনাহারে মৃত্যুর খবর অতিরঞ্জিত। তবে মৃত্যু হয়েছে অপুষ্টিতে। বেসরকারি সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ২০০১ সালের গোড়া থেকে ২০০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কেবলমাত্র ডুয়ার্সেই অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৮০০। বাদবাকি বছর কমপক্ষে আরও ২০০। অবশ্য দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই বাদে। আবার অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি প্রচারিত এক নির্বাচনী তথ্যে জানানো হয়েছে — পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫০০। সরকারি কোনও মন্তব্য নেই। কারণ সরকারি কোনও সমীক্ষাই হয়নি।

সরকারি মতে অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু বলা হলেও প্রশ্ন ওঠে, এই অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর ঘটনাগুলি হঠাৎ করে চা বাগানেই বা উঠে এল কোথা থেকে? চা বাগিচার এই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তো একদিনে তৈরি হয়নি, মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছিল অনেক আগে থাকতেই। চা শিল্পকে দেখার কথা টি বোর্ড এবং টি ট্রেডিং কর্পোরেশনের — তারা চা বাগান লুঠ হতে দেখেছে কিন্তু কিছু বলেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিশ্চুপ থেকেছে। আর সি পি এম পার্টি বাগানে বাগানে জন্ম দিয়েছে তারকেশ্বর লোহারদের। লাভ তুলেছে লুঠেরা মালিক, লুঠের অংশীদার হয়েছে সি পি এম পার্টি ও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররা সহ সরকারি আমলারা। মিলিয়ে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি এখানে। এপর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জন। রামঝোরা বাগান বন্ধ হয়েছে ২০০২ সালের ১০ আগস্ট। এখানে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। ঢেকলাপাড়া বাগান বন্ধ হয়েছে ২০০২ সালে ২২ আগস্ট। ২০০৩ থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধ হওয়া জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স ও সদর মহকুমার অন্তত ৪০টি বাগানের তালিকা দেওয়া যায়। এরমধ্যে আবার কিছু পরিত্যক্ত বাগান রয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। — যেমন নাগরাকাটা থানার লুকসান, বানারহাট থানার রেডব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর। আধা পরিত্যক্ত সদর থানার রায়পুর, শিকারপুর, ভান্ডারপুর, করলাভ্যালি প্রভৃতি।

অনাহারে মৃত্যু। বামফ্রন্ট সরকারের মতে অনাহারে মৃত্যুর খবর অতিরঞ্জিত। তবে মৃত্যু হয়েছে অপুষ্টিতে। বেসরকারি সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ২০০১ সালের গোড়া থেকে ২০০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কেবলমাত্র ডুয়ার্সেই অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৮০০। বাদবাকি বছর কমপক্ষে আরও ২০০। অবশ্য দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই বাদে। আবার অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি

একসময় জলপাইগুড়ি জেলা গড়ে উঠেছিল চা বাগিচা শিল্পকে কেন্দ্র করে। এই জেলায় চা বাগানের সংখ্যা ছিল ১৫০টির মতো। ৬০-এর দশকেও জলপাইগুড়ি শহরে ছিল প্রায় ৭০টি চা বাগানের হেড অফিস। এখন সব চা বাগানের সদর দপ্তরই স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতায়। বাগানের মালিকেরা কলকাতায় বসে স্থানীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে উৎপাদন চুক্তির ভিত্তিতে বাগান চালান। ম্যানেজারেরা চুক্তি বাঁচাতে শ্রমিকদের ঠকাচ্ছেন এবং দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সঙ্গে বুড়ো পাতা যোগ করে চায়ের গুণমানকে হত্যা করে চলেছেন। এমনি করেই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চা বাগানগুলি। ডুয়ার্সের কাঁটালগুড়ি চা বাগান বন্ধ হয়েছে ২০০২ সালের ২২ জুলাই। এখানে স্থায়ী অস্থায়ী

বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? চায়ের বাজার কি মন্দা? না তা নয়। আসল কারণ মালিক শ্রেণীর লোভ আর রাজ্যের অপদার্থতা চা শিল্পে সংকটের মূলে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চায়ের বাজার সর্বদাই তেজি। আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিবছর চাহিদা বাড়ছে কমপক্ষে এক মিলিয়ন। ভারত সরকার ২০০০ সালের মধ্যে এক হাজার মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের টার্গেট করেছিল। কিন্তু ৭০০ মিলিয়নের বেশি উৎপাদন বাড়ানো যায়নি। চা শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জমি পড়ে রয়েছে কয়েক লক্ষ আর আছে অসংখ্য কাজের মানুষ। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা কার্যকর হচ্ছে না।

চা বাগানগুলির দুরবস্থা দূর করতে ১৯৭৬ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মালিকদের কয়েকটি পরিত্যক্ত বাগান অধিগ্রহণ করা হয় এই যুক্তিতে যে, এই বাগানগুলি সরকারের যোগ্য পরিচালনায় আবার তাজা হয়ে উঠবে। দার্জিলিং পাহাড় ও জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১০টি বাগান নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ২০০২ মার্চের ক্যাগের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে — কোম্পানি দার্জিলিং জেলায় চারটি চা বাগান অধিগ্রহণ করলেও অপদার্থতার ফলে সেগুলিকে চাঙ্গা করতে চরম ব্যর্থ হয়। চা বাগান মালিকদের অপদার্থতা ও সরকারি সদিচ্ছার অভাবে চা বাগানগুলি আজ বন্ধের মুখে। মালিকশ্রেণী সুদীর্ঘকাল ধরে বাগান থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। এখন তারা বাগান বন্ধ করে, সেই জমিতে আবাসন বা রিসর্ট গড়তে চাইছেন। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ঢেউ লেগেছে। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের। কেবল পরিত্যক্ত বাগান থেকেই শ্রমিকদের পি এফ, গ্র্যাচুয়িটি, বেতন ভাতাসহ অন্যান্য বকেয়ার পরিমাণ মোট ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫১ টাকা। রাজ্য সরকার এবিষয়ে নিশ্চুপ। শিলিগুড়ি সংলগ্ন অঞ্চলে রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর প্রশ্রয়ে চা বাগান বন্ধ করে আবাসন গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছে। অথচ শ্রমিকরা কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি।

মালদায় সক্রিয় সিমি, নিষ্ক্রিয় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মালদা শহরে আবারও সিমির সক্রিয় থাকার ঘটনা প্রকাশ পেল। গত ২১ ডিসেম্বর জম্মুতে ধৃত তিন জৈশ-এ-মহম্মদ কর্মীর সঙ্গে মালদার যোগ সূত্র ধরা পড়েছে। এদিন জম্মু শহর থেকে পুলিশ গুলাম ফারিদ, মহম্মদ আবদুল্লা ও মহম্মদ ইমরানকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা প্রত্যেকেই জৈশ-এ-মহম্মদের সক্রিয় কর্মী। পাকিস্তানের ট্রেনিং প্রাপ্ত বলেও পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত তিন জঙ্গিই কাশ্মীর যাওয়ার পথে মালদাকে ব্যবহার করে বলে গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছে। গোয়েন্দারা তদন্তে নেমে আরও জানতে পেরেছেন তারা মালদার ওপর দিয়েই লক্ষ্যস্থল পৌছানোর চেষ্টা করে।

ধৃত তিন জৈশ-এ-মহম্মদ সদস্য।

দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের কাছে খবর আছে মালদায় এখনও নিষিদ্ধ সিমি বেশ সক্রিয়। ধৃত তিন জঙ্গি সিমির মদতেই বর্ডার পার হতে পেরেছে। এবিষয়ে গোয়েন্দা দপ্তর ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত প্রমাণ হতে পেয়েছে। ধৃত জঙ্গিরা স্থানীয় সিমি সমর্থকদের মদতে গোপনঘাঁটি গেড়েছিল বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর রয়েছে। এঘটনার অনেক আগেই আই বি দপ্তর সর্তক করেছিল রাজ্য সরকারকে। জানিয়েছিল জৈশ'-র কর্মীরা মালদাকে ব্যবহার করতে পারে। সজাগ করা সত্ত্বেও, হেলদোল ছিল না রাজ্য বাম সরকারের। প্রশাসনও কোনও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে অবাধেই তারা এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের একাংশও জানেন মালদাতে সিমির গোপন কাজ রয়েছে। অথচ সিমির নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠীকে তারা মদত যোগালেও তা পুলিশ জানতে পারছে না। এই ঘটনায় প্রশাসনও উদ্বিগ্ন। সিমিও বেশ সক্রিয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে সিমির মদতে, জঙ্গিরা বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাবে না তো — এই প্রশ্নই এখন মালদাবাসীর সামনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আত্মকেন্দ্রিক হিন্দু

চিঠিপত্র

সাম্প্রতিককালে কলকাতায় একটি মুসলিম বিক্ষোভ দাঙ্গার রূপ নেয়, কারণ তসলিমা নাসরিন নামে এক লেখিকার মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য তাঁর একটি গ্রন্থে লেখা হয়েছিল।

যে মুসলিম নেতারা মুসলিমদের প্রতি কোনও অবিচার হলে আওয়াজ তোলেন, সেই নেতারাই কি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের দ্বারা কোনও মুসলিমের মৃত্যু হলে টুঁ শব্দটি করেন? সেদিন তাদের মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ কোথায় যায়? এর দ্বারা কি বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের দেশপ্রেম ভারতের চাইতে পাকিস্তানের প্রতি বেশী? এখানে সাধারণ মুসলিমরাও তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সবাই হয়তো এর সমর্থক নয় কিন্তু প্রতিবাদ কোথায়? অন্যদিকে সেই পুরাতন যুগ থেকে ভারতবর্ষ অতিথিকে সম্মান জানিয়ে এসেছে। হিন্দুদের অতিথি সৎকারের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উপর আক্রমণ করেছে বার বার। এখনও করছে। কারণ হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নয়। হিন্দুদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীদের সম্বন্ধে অপমানজনক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে এরা নিজেদের ধর্মকে ঘৃণা করে। আজ সময় হয়েছে এদের চিহ্নিত করার।

বর্তমানে বাঙালি অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের উন্নতি কামনায় এতটাই মগ্ন যে পারিপার্শ্বিক সব বিপদ সম্বন্ধে কোনও ধারণা বা খেয়াল নেই। তারা ভুলে গেছে যে একদিন নিজেরা তাদের চৌদ্দ পুরুষ, বাবা-ঠাকুর্দার ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পরভূমে বসবাস করছে। আদিকাল হতে যা সঞ্চয় করেছিল তা অন্যে ভোগ করছে। কিন্তু এরা ভাবছে শুধুমাত্র আমার পরিবার, আমার সন্তান সুখে থাকলেই হল। এদের সন্তানরা ভাল স্কুলে পড়বে, বড় চাকরি করবে তাহলেই হল। আর যুব সম্প্রদায় — তারা বাইক চড়বে, প্রেম করবে, স্বপ্ন দেখবে আর নিজেদের সংস্কার-সংস্কৃতি ভুলে চারপাশের জগতের বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে নিজেদের নিয়ে মশগুল থাকে। আর সব দায় সরকার ও নেতাদের উপর চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে। এরাই সমালোচনায় মুখর হয়। কোনও মুসলিম আক্রান্ত হলে হিন্দুরা গেল গেল রব তোলে, কিন্তু কোনও হিন্দু আক্রান্ত হলে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। উদাহরণ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ হিন্দু পণ্ডিতরা। যদি এর বিরুদ্ধে কেউ রুখে দাঁড়ায় তাহলে সে সাম্প্রদায়িক। এর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন এবং তা করতে হবে আমাদের। হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে না হলে ধবংসকে আহ্বান করতে হবে।

নরেন্দ্র নারায়ণ পাল, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

।।২।।

১৯৪৭ সাল থেকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দরবার করে আসছে। ফল কি হয়েছে — ভারতের জমি গেছে পাকিস্তানের দখলে। আর সেই দখলীকৃত জমিতে ছত্নখন্ধ গড়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা। রীতিমতো কমান্ডো ধাঁচে উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতে। উগ্রপন্থী বনাম ভারতের সেনাবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনীর লড়াইটা গত পঞ্চাশ বছরে আর কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ নেই। এখন ভারতের প্রতি ইঞ্চি জমিতে পাকিস্তানী উগ্রপন্থী তথা আত্মঘাতী বাহিনীর অবাধ বিচরণ। আর ওই আত্মঘাতী বাহিনীর সাথে মিশে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করছে এক শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান এবং তথাকথিত সেকুলারবাদী মানবতাবাদী একদল হিন্দুও। সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের আমেরিকার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করা উচিত। বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ধবংসের পর আমেরিকা কোনও আবেদন নিবেদন না করে সোজা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল। এখনও আমেরিকার সেনাবাহিনী সেখানে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। পাকিস্তানের আফগানিস্তান লাগোয়া পেশোয়ার বা ওয়াজিরিস্তানের পাক-তালিবানরা যখন তখন চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে আমেরিকানদের উপর। আর আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তানের কোনও প্রতিবাদে আমেরিকা কর্ণপাত করেছে না।

মাত্র কদিন আগেই ভারতের একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতিনিধি আই এস আই-এর বিধিবৎ অনুমতি নিয়ে লস্কর-এর হেডকোয়ার্টার-এ গিয়ে যাবতীয় প্রশিক্ষণের কর্মকাণ্ড দেখে এসেছে। ওই চ্যানেলে ছচ্চস্তন্ত্র বদ্দগ্ন তা বিস্তারিতভাবে দেখানোও হয়েছে।

এসব দেখে শুনে এটাই বাস্তব বলে ভাবতে হবে যে, পাকিস্তানের আসল নিয়ন্ত্রণকর্তা আই এস আই। তাদের উপর সেনা, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কোনও কর্তৃত্ব নেই। যে সন্ত্রাসবাদীরা বেনজিরকে হত্যা করেছে তাদেরকেই মানিয়ে চলতে হচ্ছে তার স্বামী তথা পাক রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে।

দেবাশিস ব্যানার্জী, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬

রতনে রতন চেনে

ভিনি ভিডি ভিসি — এলেন, দেখলেন জয় করলেন। কথাটা আর কারোর উদ্দেশ্যে নয়, স্বয়ং মারাদোনার উদ্দেশ্যে। প্রথম প্রশ্ন, কেন মারাদোনাকে আনা হোল? উদ্দেশ্য কি? এর কিন্তু কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না ক্রীড়ামন্ত্রীর নিকট হতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ক্রীড়ামন্ত্রীর খামখেয়ালিপনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

যুবভারতীতে যা হল তা আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার নগ্নরূপই আবার প্রকট হয়ে উঠছিল। কাদের নিয়ে অনুষ্ঠান বোঝা গেল না। মারাদোনা, পুলিশ, ক্যাডার না ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেকে নিয়ে। আমরা ছোটোবেলায় গোপাল ভাঁড়ের অনেক কীর্তি পড়েছি, হেঁসেছি, আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু বর্তমানের ভাঁড়ের ভাঁড়ামিতে হাসি পেল না, কারণ গোপালের ভাঁড়ামিতে টাকা লাগত না। এই ভাঁড়ের ভাঁড়ামিতে কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অর্থ তছনছ করে উনি একবার গঙ্গাবক্ষে নাটক করলেন। সুভাষবাবুর হঠাৎ প্রাক্তন বঙ্গেশ্বরের সাথে মারাদোনার সাক্ষাৎকারের কি বদবুদ্ধি হল। জ্যোতি বসু কি আগে ফুটবল খেলতেন নাকি? অবশ্য সুভাষবাবুর ফুটবল জীবনের কোনও আলোকপাত কেউ করেনি এর আগে।

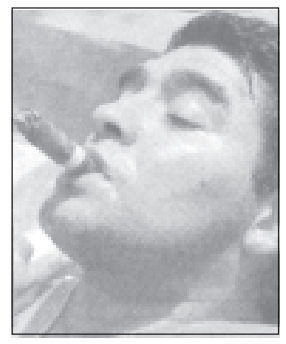

যাই হোক, জ্যোতি বসু তো খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাই মারাদোনার সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেবার জন্য ঐ অ্যালবাম-এ কাস্ত্রোর সাথে নিজের ছবি

দেখিয়ে মারাদোনাকে উদ্বুদ্ধ করার বেশ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। মারাদোনাকেও মনে হয় বামপন্থী। জ্যোতি বসু তদ্বির করে মারাদানোকে পলিটব্যুরোর সভ্য করে নিলে পলিটব্যুরোর তো মান অনেক বেড়ে যেতো।

এবার আসা যাক্ মারাদোনা আসাতে বাংলার ফুটবলের কি উন্নতি হল যেটা সুভাষবাবুর ভীষণ ইচ্ছা। তাই সরকারি কোষাগারকে আরও একটু খালি করে বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য মিশর, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী ও তুরস্ক যাচ্ছেন। জানি না কী শিখে আসবেন। অবশ্য মারাদোনার পিছনে সাকুল্যে ১২ কোটি টাকা খরচের পর বিদেশ ভ্রমণে একটু সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু জনগণ কিছু বলবে না কারণ আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি প্রয়োজন। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

পরিশেষে জানাই ১৪ বছর আগে খেলা থেকে অবসর নেওয়া, ১২ বছর ধরে মদ কোকেন আসক্ত একব্যক্তি যে কিনা একটি বিতর্কিত গোল দেওয়ার পরেও যার কোনও অনুশোচনা নেই, যিনি নিজের প্রচার নিজেই করে থাকেন, তিনিই নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার। গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার খেলায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাঠে মস্তানদের মতো আচরণ করেন, ব্যবহারিক জীবনে এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে সুভাষ বাবু কেন যে সম্বর্ধনা দিতে গেলেন উনিই জানেন। হয়তো রতনে রতন চেনে তাই।

পেলে, বেকেনবাউয়ার, প্লাতিনি, পাওলো রোসিদের নাম কি সুভাষবাবুর মনে পড়েনি? সত্য কি বিচিত্র এই রাজ্য?

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী

কমরেড বুদ্ধদেববাবুকে রক্তিম অভিনন্দন

দিলীপ কুমার বিশ্বাস

জনমত

কমঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আপনাকে আমার রক্তিম অভিনন্দন। আপনি সাচ্চা কম্যুনিস্ট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনি নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর ও অন্যত্র প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের স্তব্ধ করে দিতে না পারলেও প্রচন্ড আঘাতে অগুণতি শ্রেণীশত্রুকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে পেরেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রেণীশত্রুদের একমাত্র অধিকার যে মৃত্যু তা আপনার মতো ভাল করে বুঝতে পারেন এমন লোক ভূ-ভারতে ক'জন আছেন?

কমরেড, আপনি একজন তাত্ত্বিক কম্যুনিস্ট, তাই আপনি কমরেড লেনিনের কথা "একনায়কতন্ত্র হচ্ছে সেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ যা শুধুমাত্র সীমাহীন ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল — কমও নয়, বেশিও নয়। কোনও কিছুই এই ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না" মনে রেখেছেন।

কম্যুনিস্ট ইতিহাসে আপনি নিশ্চয় অবিচল বিশ্বাস রাখেন, আর বিশ্বাস রাখেন বলেই কমঃ লেনিন কীভাবে অগুণতি (এক লাখ) লোককে শেষ করেছিলেন, কমঃ মাও কীভাবে ভূমি সংস্কারের নামে লাখ লাখ কৃষককে হত্যা করেছিলেন তা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী (আপনাদের মতে) প্রতিক্রিয়াশীলদের হত্যা করে আপনি তার নমুনা দেখিয়েছেন।

কমরেড, আপনি ও আপনার সহকর্মী কমরেডরা চিরকাল কৃষক ও শ্রমিকদের (ধবংসের?) জন্য সংগ্রাম করেছেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতেও যে তা করবেন তাতে কি কারও সন্দেহ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই না। এই সহজ সত্যটা পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও শ্রমিকরা কেন যে বুঝতে পারছেন না এবং কেনই বা এরা আপনাদের বিরোধিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তারা বুঝলেনই না যে ওইসব বিরোধীরা ভূষিমাল (বিমান কথিত)। ওঁরা অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত (সুভাষিত বাণী)।

দোষ নেবেন না কমরেড, আমরা আপনার হিতাকাঙ্খী, তাই সাহস করেই বলি আপনাদের সঙ্গে যেসব বুদ্ধিজীবীরা এতদিন ঘর করতেন তাঁদের মধ্যে কিন্তু দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। দেখছেন না ওঁরা রাস্তায় নেমে কী রকম হাত পা ছুঁড়ছেন? কয়েকজন বিগড়ে যাওয়া কৃষক ও শ্রমিক মেরে জনগণের ছত্নন্দ্বপ্সম্মপ্তন্দ্ব'দ্দগ্ন কাজকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? তার থেকে ওই ভূষিমাল বুদ্ধিজীবীদের দু'চারটাকে মেরে বস্তায় ভরে হলদি নদীর জলে ফেলে দিলে দেখবেন ত্নন্দ্বপ্সম্মপ্তন্দ্বত্রজ্ঞ কত সহজ হয়ে গেছে। ওই যে দাড়িওয়ালা শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ঠাকুর, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী, ওঁরা কি আঁকেন, কি বকেন, ওঁরা কি লেখেন? যত সব ফালতু। ছোঃ, কিন্তু কমরেড, ওঁদের কথা লোকে ইদানিং বড্ড বেশি শুনছে ও মানছে, তাই বলি—ওঁদের ঝাড়ে মূলে খতম করুন। ভুলে যাবেন না কম্যুনিস্ট ইতিহাসের শিক্ষা হল দমন, আর তা আপনারা করেন জনগণের স্বার্থে। একবার কম্যুনিস্ট রাজত্ব কায়েম হলে, জনগণের অর্থাৎ ত্নন্দ্বপ্সম্মপ্তন্দ্ব-এর স্বাধীনতা কথাটার কোনও অর্থই হয় না। যিনি ক্ষমতায় থাকবেন তিনি যা ভাববেন যা করবেন, ব্যস— অন্য কোনও রকম ট্যাঁ ফুঁ করলে ঘ্যাঁচাং।

কমরেড, ফেলিক্স জেরজেনিস্কিকে মনে পড়ে? যিনি ছিলেন সোভিয়েত গোপন পুলিশ

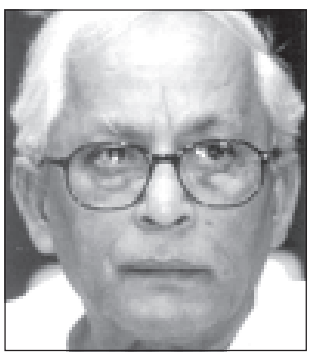

বাহিনীর প্রধান, যাঁর অধীনে ছিল ভয়ঙ্কর বন্দুকবাজরা, যিনি বলেছিলেন 'এখন বিচার-টিচারের কথা ভাববার সময় নয়। এখন আমাদের ভাবতে হবে শুধু দমন করার কথা। যারাই আমাদের বিরোধিতা করবে তাদেরই হত্যা করতে হবে।' আর এই ফেলিক্স জেরজেনিস্কি ছিলেন কমঃ লেনিনের অত্যন্ত কাছের লোক — প্রিয়পাত্র। কমরেড আজ ফেলিক্স জেরজেনিস্কি নেই, কিন্তু আপনাদের সুশান্ত ঘোষ আছেন যিনি আপনার হুকুম পেলে, হাজার প্রতিক্রিয়াশীল কুত্তার লাশ এক মুহূর্তে ফেলে দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন মার্কসবাদ বিজ্ঞান তাই সত্য।

কমরেড ভট্টাচার্য, আপনার সঙ্গে সুশান্ত ঘোষ, তপন ঘোষরা থাকতে আপনাকে কেন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে চটি পায়ে মাথায় বাজারের টুপি পরা নরকের প্রহরীদের মতো কুৎসিৎ দর্শন ক্যাডারদের পাঠাতে হল কতকগুলো হল্লাবাজকে খুন করার জন্য? ঘোষ এন্ড কোং-এর বন্দুকবাজরা কোথায় ছিল?

কমরেড আপনার অনেক সুকৃতি। কলকাতার বুকেই তো পুলিশমন্ত্রী হিসাবে কতজনকেই না গুলি মেরে তুড়ি মেরে সাবাড় করে দিয়েছেন। আপনার মতো এহেন মহান কমরেডের কেন মতিভ্রম হল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের দখল নিতে গিয়ে? কম্যুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী আপনার জেরজেনিস্করা ও তাঁদের বন্দুকবাজরা থাকতে আপনি কিনা আপনাদের পার্টির কিছু স্কাউনড্রেলকে পুলিশের পোশাক পরিয়ে পাঠালেন! পাঠালেনই যদি তবে তাদের হাতে বন্দুক তুলে দেননি কেন? তাদের গায়ে পুলিশের পোশাক ঠিক আছে, কিন্তু পায়ে রাবারের চটি ও কোমরে ছেঁড়া গামছা কেন? জৌলুস কোথায়? এতো ভিখারী পার্টির দৈন্যদশা।

কমরেড, ভারতের লোকগুলো নির্বোধ। তাই 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় কী নেহী' তা বুঝলো না, বুঝলে ভারত পুরোপুরি কম্যুনিস্ট দেশ হত। আর তার প্রধানমন্ত্রী যদি আপনি হতেন তবে চক্রবর্তী মশায়কে এতদিনে উপর বা নীচে যে কোনও একটা দিকে চলে যেতেই হতো। তেমনি আপনি কমরেড জ্যোতি বসুর আমলে যখন চোরেদের মন্ত্রীসভা ত্যাগ করে বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন তখন কোনও কম্যুনিস্ট দেশ হলে আপনার গতি কী হত? যা হোক, এখন আপনি ক্ষমতায়, বরং একটু বদলে বলি, এখন ক্ষমতা আপনাদের (থ্রি মাস্কেটিয়ার্স?) হাতে। এই ক্ষমতা কেন এখনও পর্যন্ত আপনাদের সেই নৈতিকতায় পৌঁছে দিচ্ছে না। যা বলে ক্ষমতার বলেই শাসন — এবং এই শাসনের বলে। রোজা নুক্সেমবার্গের হত্যা কিম্বা ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর গণ অভ্যুত্থানকে ট্যাংকের তলায় পিসে দেওয়াই কম্যুনিস্টদের বিজ্ঞান — তাই সত্য। কমরেড আপনি নিশ্চয়ই জানেন অক্টোবর ১৯১৭ থেকে লেনিনের মৃত্যু অর্থাৎ জানুয়ারি ১৯২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেনিন ও বলশেভিক পার্টি মেনশেভিক, সোসাল রেভলিউসানারিজ, পপুলিস্ট সোসালিস্ট ইত্যাদি পার্টিগুলোকে ধবংস করেছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার অপরাধে। আজ বামফ্রন্টের শরিকরাও তো প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরভুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁদের বাঁচার অধিকার কি কমঃ লেনিন স্বীকার করতেন? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আলবৎ না।

কমঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাচ্চা কম্যুনিস্ট হিসাবে আপনার কি কর্তব্য? জনগণের স্বার্থে এই সব পার্টিগুলোকে শেষ করা ও এই সব পার্টির নেতাদের দেহগুলোকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া। আর দেরি নয়। ডডপ্স নন্দ্ধ ৩প্সভ্র-এ আমরা ভরসা রাখি, কমরেড আপনি পারবেন। আগাম বলে রাখি — সাবাস কমঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সাবাস।

পরম্পরা

জয়সলমীরের তনোতেশ্বরী মন্দির এখনও নিরাপত্তাবাহিনীর বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু। আর এই বিশ্বাসের টানেই হাজারে হাজারে ভক্ত আসেন তনোতেশ্বরী দেবীর দর্শনে। সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রার্থনা জানান দেবীর কাছে। ভক্তের কাতর আকুতি কখনও বিফলে যায়নি। তাই তনোতেশ্বরী প্রতি ভক্তের ভক্তি আজও অটুট। শুধুই কী বিশ্বাস! বিশ্বাস যে আছে, তা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে যুক্তি তথ্যও। রাজস্থানের এই দেবী শুধু হিন্দুদের নয়। বহু গোঁড়া মুসলিমও আসেন দেবীর দর্শনে। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে। এই জন্যই তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিপদতারিণী মাতা তনোতেশ্বরী।

তনোতেশ্বরী বিগ্রহ

১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধে দেবী নিজেই ভক্তদের সন্তানের মতো রক্ষা করেছেন। শত্রুপক্ষের শত শত রকেট, সেল, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে — দেবীর কৃপায়। মা'র কৃপাতেই ক্ষতি হয়নি মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এলাকার। ৭১'র যুদ্ধে দেবীর এই স্থানও যুদ্ধের আওতা থেকে বাদ ছিল না। কিন্তু ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তান, শত্রুপক্ষ। দেবীর মাহাত্ম্যে পরাজিত হয়েছে পাকিস্তান। এই যুদ্ধে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া প্যাটন ট্যাঙ্কটিকে কাজে লাগিয়েছিল। ট্যাঙ্কের হাত থেকে বাদ ছিল না তনোতেশ্বরী মন্দির। শত্রুপক্ষ পাকিস্তান ভারতের বহু সেনা পোস্ট গুড়িয়ে দিয়েছিল। এত সবের পরেও দেবী নিজেই, বিপদতারিণী হিসাবে রক্ষা করেছেন ভক্তদের। দেবীর মাহাত্ম্য আশ্চর্য করেছিল ৭১-এর যুদ্ধের পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার শাহনাজ খানকে। তিনিও এই

তনোতেশ্বরী মন্দির।

ঘটনায় বিস্মিত হন। দেবীর দর্শনে ছুটে আসেন। পাক সরকারের অনুমতি নিয়ে, দেবীর পুজো দেন। মা'র চরণে দান করেন রুপোর ছত্র। যা আজও মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরে নিস্ক্রিয় সেই সমস্ত বিস্ফোরকগুলিও রাখা আছে। ভক্তরা আজও সেগুলি চাক্ষুষ করেন। সেই থেকেই দেবীর কথা, মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা প্রতি বছর দেবীর দর্শনে আসেন — পূজা দেন। আর তাদের দেখভালের জন্য বি এস এফ থাকে সক্রিয়। সমস্ত কিছুর তারাই ব্যবস্থা করে। সে যুদ্ধের বহু সৈনিকও মন্দিরে আসেন দেবীর কৃপালাভ করতে। মানত করেন আপন মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য। নবরাত্রির দিন দেবীর দর্শনে আসেন বহু দূর-দূরান্তের ভক্তরা। বি এস এফ জাওয়ানরা এসময় সক্রিয় থাকেন। তাদের সুরক্ষার ঘেরা টোপে সম্পন্ন হয় দেবীর পূজা। রাজস্থানের জয়সলমীর-এর বিপদতারিণী দেবী তনোতেশ্বরীর দর্শনে ধন্য হয় হাজার হাজার ভক্ত।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান— গ্রহ নক্ষত্রের ধারণা

কমলবিকাশ ব্যানার্জী

সূর্য এবং চন্দ্রের কথা বেদে আছে। এ ছাড়াও বৈদিক ঋষিদের পাঁচটি গ্রহ সম্পর্কে ধারণা ছিল। ঋগ্বেদে (১।১০৫।১০) একটি সুক্তে আছে — 'পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ' আকাশে আছেন। এই পঞ্চ অভীষ্টদাতাকে পঞ্চ গ্রহ হিসেবে মনে করার সংগত কারণ আছে। তাই বলা যায় সূর্য এবং চন্দ্রসহ ভারতীয়রা সাতটি গ্রহ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সে যুগে সূর্য এবং চন্দ্রকে অনেক সময় গ্রহ হিসেবে ধরা হত। ঋগ্বেদের আমলে দেওয়া এই গ্রহগুলির কয়েকটির নাম এখনও প্রচলিত আছে। যেমন মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্র। অধ্যাপক লুড্‌উইকের মতে প্রাচীন ভারতীয় পন্ডিতগণ যে শুধু সূর্য এবং চন্দ্রের আবর্তনের কথাই জানতেন তা নয়, সূর্য পথ এবং বিষুব বৃত্তের পরস্পর অবনতি এবং পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণন সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। সূর্যের বার্ষিক চলার পথ যে দুই অর্ধে বিভক্ত সেকথা শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৪।৩) উল্লেখ আছে। সূর্যের এই চলার পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিনায়ন। যদিও উত্তরায়ণকে সে সময় বলা হত উদগয়ণ। সূর্য যখন উত্তরয়ণের পথে তখন দেখা দেয় বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতু। এই তিনটি ঋতুকে বলা হত দেবতাদের ঋতু।

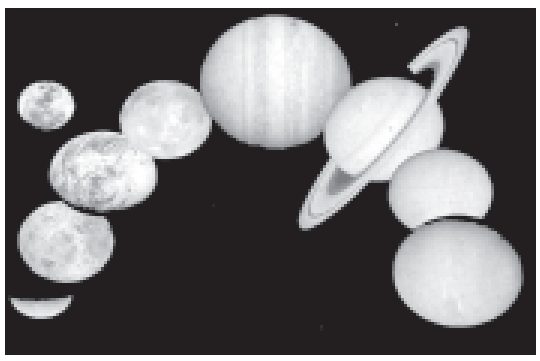

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাবার পরেই রাতের আকাশ ঝলমল করে ওঠে গ্রহ নক্ষত্রের মালাতে। তারকাখচিত এই রাতের আকাশ বৈদিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছিল। সে সময় দূরবীণ ছিল না, কোনও উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা আধুনিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করে। ভূষণে সজ্জিত পিঙ্গলবর্ণ সেক্টরের সঙ্গে নক্ষত্র সজ্জিত গগনের তুলনা করা হয়েছে ঋগ্বেদে (১০।৬৮।১১)। এখানে অশ্বের সূর্যের সম্পর্ক আছে। বৈদিক পন্ডিতগণ পৃথিবীকে পরিমণ্ডল বলে বর্ণনা করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। তাই অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা পৃথিবীকে গোল হিসেবে জ্ঞান করতেন। এই সকল পন্ডিতদের গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি সম্পর্কে যে ধারণা ছিল ঋগ্বেদে তার আভাস আছে।

বৈদিক যুগে তারকা এবং তারকা মন্ডলকে দেবতা জ্ঞানে দেখা হত। ঋগ্বেদে অশ্বিদয়ের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, অশ্বিদ্বয় উজ্জ্বল দ্যুতি বিশিষ্ট, তাঁরা স্বর্গে বা অর্ণবে অবস্থান করেন। এঁরা প্রভাতে দেবতার আগে উদয় হন। এঁরা দ্রুতগামী। অশ্বিদয়ের বর্ণনা থেকে মনে করা যেতে পারে যে এই তারা দুটি হল মেষ রাশিতে অবস্থিত আলফা (Alpha) এবং বিটা অ্যারাইটিস (Beta airites) নামের দুটি তারা।

বেদ চারটি। তার ৬টি অঙ্গ অর্থাৎ ৬টি অস্ত্র। এগুলি হল — ব্যাকরণ, নিরুক্ত, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ ও জ্যোতিষ (প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জ্যোতিষ বলা হত)। এই ৬টি শাস্ত্রকে একসঙ্গে বলা হয় বেদাঙ্গ। এর মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়কে বলা হয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ভাস্করাচার্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সম্পর্কে বলেছেন, জ্যোতিঃশাস্ত্র কালবোধক শাস্ত্র। অর্থাৎ, যজ্ঞ কার্য সম্পাদনের জন্য কাল নির্ণয় হল বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যেসব ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রাচীনতম। এর রচনাকাল খ্রিঃ পূঃ ৬০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থটিকে বৈদিক যুগের পঞ্জিকা বলা চলে।

আমরা তিনটি বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সন্ধান পাই। প্রথমটি ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। এতে ৩৬টি শ্লোক আছে। দ্বিতীয়টি যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। এতে সোমাকরের টীকাসহ ৪৩টি শ্লোক আছে। এর মধ্যে ৩০টি শ্লোক অবশ্য ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ থেকে নেওয়া। অর্থের দিক থেকে মিল থাকলেও, ছন্দ এবং শব্দ চয়নে তফাৎ আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষে নতুন শ্লোকের সংযোজন ১৩টি। তৃতীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে বলা হয় অথর্ব জ্যোতিষ। এতে ১৬২টি শ্লোক আছে।

ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে চন্দ্র সূর্য একত্র হলে যুগ। অর্থাৎ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে চন্দ্র সূর্য একত্র হলে, সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু। আর তখনই বৎসর আরম্ভ। ষষ্ঠ শ্লোকে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন শুরু যথাক্রমে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের মধ্যভাগে। অর্থাৎ মাঘ মাসে উত্তরায়ণ আরম্ভ, আর শ্রাবণ মাসে দক্ষিণায়নের শুরু। সপ্তম শ্লোকে দিন-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির কথা বলা আছে। সূর্য যখন উত্তরায়ণের পথে তখন দিনের বৃদ্ধি, এবং রাত্রির হ্রাস। আর সূর্য যখন দক্ষিণায়নের পথে তখন উল্টোটা। চান্দ্রপথে যে ২৭টি নক্ষত্র আছে ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের চতুর্থ শ্লোকে তার উল্লেখ আছে। তবে নক্ষত্রগুলির সম্পূর্ণ নাম সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল নক্ষত্রের অধিদেবতার নামের আদ্যাক্ষর বা অন্তাক্ষর নেওয়া হয়েছে। যেমন,

১। জৌ — অশ্বযুজৌ (অশ্বিনী)
২। দ্রা — আর্দ্রা
৩। গঃ — ভগঃ (পূর্ব ফল্গুনী)
৪। খে — বিশাখে (বিশাখা)
৫। শ্বে — বিশ্বে দেব (উত্তর আষাঢ়া)
৬। হিঃ — অহির্বুধ্ন্য (উত্তর ভাদ্রপদা)
৭। রো — রোহিনী
৮। যা — আশ্রেষা (অশ্লেষা)
৯। চিৎ — চিত্রা
১০। মূ — মূলা
১১। যক্ — শতভিষক্ (শতভিষা)
১২। ণ্যঃ — ভরণ্যঃ (ভরণী)
১৩। সু — পুনর্বসু
১৪। মা — অর্যমা (উত্তর ফাল্গুনী-১)
১৫। ধা — অনুরাধা
১৬। নঃ — শ্রবণঃ (শ্রবণা)
১৭। রে — রেবতী
১৮। মৃ — মৃগশিরা
১৯। ঘা — মঘা
২০। স্বা — স্বাতী
২১। পঃ — আপঃ (পূর্ব আষাঢ়া)
২২। অজঃ — অজ একপাদ (পূর্ব ভাদ্র পদা)
২৩। কৃ — কৃত্তিকা
২৪। ষ্যঃ — পুষ্যঃ (পুষ্যা)
২৫। হ — হস্ত (হস্তা)
২৬। জ্যে — জ্যেষ্ঠা
২৭। স্থা — শ্রবিষ্ঠা।

প্রথম দিকে আর্য ঋষিরা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করতেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দেখা যাচ্ছে বৎসরের হিসেব ৩৬৬ দিনে করা হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থে পঞ্চ বার্ষিক চান্দ্র সৌর পর্যায়কালের কথাও বলা হয়েছে। এই পর্যায় কালের হিসেব থেকে আমরা পাই।

সাবন দিন (civil days)-১৮৩০
নক্ষত্র দিন (Sideral days)-১৮৩৫
চন্দ্রযুতি (Sjnodic month) -৬২
সৌর দিন (Solor days) — ১৮০০
সূর্যের পূর্ণ পরিক্রমণ (Suns revolution) — ৫
চন্দ্রের পূর্ণ পরিক্রমণ (Moon's revolution)—৬৭

ভক্তের ভগবান

রমানন্দ ও কমলার মধ্যে সেদিন হঠাৎই ঝগড়া। এ বলে আমি ঠিক বলছি, তো ও বলে আমি। গলার আওয়াজে কচিকাচারাও জড়ো হয়েছিল। সন্ধ্যা গড়াবার মুখে হঠাৎ কী হল। সেই কৌতুহল মেটাতে প্রতিবেশীদেরও ভিড় বার ছিল। গ্রামের মধ্যে রমানন্দ ও কমলা সকলের পরিচিত। গ্রামের এক ধারে ওই দম্পতির বাস। সুখী পরিবার। সারাদিনই ধর্ম-কর্ম নিয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ কলহ কেন! প্রতিবেশীরা ঝগড়ার সামাল দিতে চেষ্টা করলেও তারা বিফল হয়। তাই শেষমেশ অনেকেই নিজের কাজের তাগিদে ফিরে যায়। অনেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ঝগড়া তখনও প্রায় মধ্য গগনে। ঘটনাক্রমে সেসময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সত্যানন্দ মহারাজ। তাঁর কানেও হট্টগোলের আওয়াজ আসে। প্রতিবেশীরা মহারাজকে দেখতে পেয়ে চেপে ধরলেন। তাঁকেসব কিছু খুলে বললেন। তবে প্রতিবেশীরা ঝগড়ার মূল কারণ না জানায়, মহারাজ তাদের কথায় কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবশেষে তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। মহারাজ কাছে যেতেই সব ঠান্ডা। প্রতিবেশীরা অবাক। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

মহারাজ রমানন্দর মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। রমানন্দর যুক্তি — ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম নাকি মধুসূদন নয়। তাঁর মতে মধুসূদন কোনও গল্পের নায়ক। যে কোনও এক বালককে দই জুগিয়েছিল। তাই রমানন্দর কথা, স্ত্রী কমলা যেন শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নামে না ডাকে বা তার নাম জপ না করে। মহারাজ সব শুনে মনে মনে হাসলেন। প্রতিবেশীরাও হাসতে হাসতে ফিরে গেল। অনেকে বলল, 'যত সব পাগল'। কিন্তু মহারাজ থামলেন না। তিনি রমানন্দর উদ্দেশ্যে বললেন, রমানন্দ, তুমি কাল একবার আমার আশ্রমে এসো। এখন প্রায় সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে। সন্ধ্যা আরতির সময় হয়েছে। তাই কাল এসো।

পরের দিন একেবারে ভোরেই রমানন্দ আশ্রমে হাজির। মহারাজ ভাবলেন,

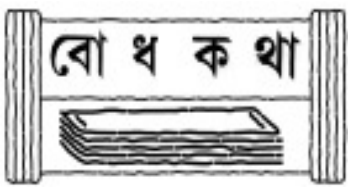

সতীনাথ রায়

রমানন্দর রাত্রিতেও বোধ হয় ঠিকমতো ঘুম হয়নি। গঙ্গার ধারেই মহারাজের আশ্রম। সেসময় তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করছিলেন। রমানন্দর আওয়াজে চোখ খুললেন। দেখলেন রমানন্দ করজোড়ে দাঁড়িয়ে। তিনি রমানন্দকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, রমানন্দ তুমি গঙ্গার ওই ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরে এসো, তারপর কথা হবে। রমানন্দ স্নান সেরে ফিরে এলেন। সকালের স্নানটা খারাপ লাগল না তাঁর।

মহারাজ বললেন, রমানন্দ, স্নান কেমন লাগল? রমানন্দ প্রসন্ন চিত্তে উত্তর দিলেন, ভালোই লাগল মহারাজ।

একটু পরেই মহারাজ রমানন্দকে আরও একবার ডুব দিয়ে আসতে বললেন।

মহারাজের আজ্ঞা। তাই অমান্য করার সাহস রমানন্দর মধ্যেও ছিল না। তিনি আবার ডুব দিয়ে সিক্ত বসনে ফিরে এলেন। মহারাজ রমানন্দকে আবারও অন্য একটা ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরে আসতে বললেন।

রমানন্দ মনে মনে বিরক্ত হলেন। কিন্তু মহারাজের মুখের ওপর জবাব দিলেন না। অগত্যা আবার স্নান সেরে ফিরে এলেন। মহারাজ, রমানন্দকে এবারও কিছু বলতে সুযোগ দিলেন না। তিনি আবার তাঁকে স্নান করে আসতে বললেন। কিন্তু রমানন্দ আর সহ্য করতে পারলেন না। অবশেষে বলেই ফেললেন, মহারাজ, গঙ্গা তো একটাই, তাহলে এই ঘাট ও ঘাট কেন? একটা ঘাটে স্নান করলেই তো হল। মহারাজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন। বললেন — তোমার কথা ঠিক। কিন্তু রমানন্দ ঈশ্বরও তো এক। তাঁকে তুমি ভাগ করছ কেন? ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ। তাঁকে তুমি যে নামেই ডাক না কেন, তিনি তাতেই তুষ্ট। তিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন। ভক্তিতে সাড়া দেন। তাই তো তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নাম নন, ভক্তি দেখেন।

মহারাজের কথায় রমানন্দর চৈতন্য হল। তিনিও বুঝলেন, ঈশ্বর নামে নয়, ভক্তিতে সাড়া দেন। তাই আর কোনও কথা না বলে মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। আটাশ

জীবনে বিজ্ঞান

হৃদরোগের দাওয়াই দানা-শস্য

হৃদরোগে আক্রমণের সম্ভাবনা কমায় দানা-শস্য। টানা ১৮ বছরের সমীক্ষায় মার্কিন গবেষকেরা দেখেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে প্রাতঃরাসে নিয়মিত ছোলা বা মুগডালের মতো দানাশস্য খেয়ে আসছেন, তাঁদের হৃদযন্ত্রের গোলযোগ নেই বললেই চলে। দানা-শস্যে পাওয়া ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, আঁশ এক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর।

অপরাধী সীসাযুক্ত পেট্রল

সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীতে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরিবেশবিদদের মতে সীসার বিষই এর কারণ। সীসা মানুষের রাগ, হিংসা এবং অপরাধবৃত্তি বাড়িয়ে দেয়। গাড়িতে ব্যবহৃত সীসাযুক্ত পেট্রল পুড়ে বাতাসে মিশে মানুষের মস্তিষ্ককে দূষিত করে। ইউরোপ ও আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে যানবাহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সীসাহীন পেট্রল ব্যবহার করে কমবয়সীদের মধ্যে অপরাধবৃত্তি কমাতে সক্ষম হয়েছে।

চকোলেট খান কোলেস্টেরল কমান

কে বলে চকোলেট খেলে মোটা হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা বলেছেন, কোলেস্টেরল কমাতে চকোলেটের জুড়ি নেই। এছাড়া নিয়মিত চকোলেট খেলে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে আসে। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত জার্নাল অব নিউট্রিশন'-এ এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, শুধু চকোলেট নয়, কোকো অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মেশানো ভেষজ স্টেরলই কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

বুদ্ধি ধররা বাঁচেন বেশি

পরমায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কের গভীর সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন ইতালির ক্যালিব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। পঁচিশের বেশি নারী-পুরুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, সাধারণ বুদ্ধি র মানুষের থেকে অন্তত ১৫ বছর বেশি বাঁচেন প্রখর বুদ্ধি ধররা। সমৃদ্ধ মুস্তিষ্কের ক্ষয় হয় ধীরে।

আর্কিমেডিসের তত্ত্বের খোঁজে

ভাসমানতা, মাধ্যাকর্ষণ এবং গণিত সংক্রান্ত আর্কিমেডিসের বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অষ্টম শতকে ছাগলের চামড়ার একটি পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তিনশ বছর পর এক খৃস্টান যাজক সেই পুঁথির লেখা মুছে তাতে প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করেন। সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আর্কিমেডিসের হারিয়ে যাওয়া তত্ত্ব এক্সরের সাহায্যে ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জানান, মূল লেখার কালিতে যে-লৌহকণা ছিল, তা এক্সরেই খুঁজে বার করে দিয়েছে। এই তথ্য মানব শরীরের নানা রোগের উপসর্গ খুঁজে বার করতে গবেষকদের সাহায্য করবে বলে দাবি করেছে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

মারণ সেলফোন

সেলফোন নিয়ে নতুন সমীক্ষা বলছে, দীর্ঘদিন এর ব্যবহার সত্যিই মস্তিষ্কে ম্যালিগ্ন্যান্ট টিউমারের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। টানা ১৭ বছরের বেশি দিনে একঘন্টা বা অন্তত দু'হাজার ঘন্টা সেল ব্যবহার এই টিউমারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

— নির্মল কর

উলুবেড়িয়াতে জগদীশ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী

গত ৩০ নভেম্বর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু'র ১৫০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে সমাজসেবা ভারতী, উলুবেড়িয়া শাখার পক্ষ থেকে তাঁতিবেড়িয়ার 'সারদা শিশু মন্দির'-এ জন্মদিবস পালন করা হয়। এই বরেণ্য বিজ্ঞানীর জীবনী, কর্মপন্থা ও তাঁর সনাতন হিন্দুত্ব ভাবনায় বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ পল্লব দে সরকার। সমাজসেবা ভারতীর পরিচালনায় এবং সারদা শিশুমন্দির ও স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের সহায়তায় এদিন শিশু মন্দিরে একটি অর্শ নিরাময় শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট অর্শরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি. সাহার নেতৃত্বে চিকিৎসকের একটি দল এদিন সম্পূর্ণ ভেষজ পদ্ধতিতে ৪১ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।

শৌর্য দিবস

গত ৬ ডিসেম্বর বজরং দলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর শহরের জগন্নাথ মন্দির চকে পালিত হল শৌর্য দিবস। এদিন ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বিতর্কিত বাবরি কাঠামো ধ্বংস ও শ্রীরাম মন্দির পুর্ননির্মাণের দিনটি স্মরণ করা হয়। প্রাস্তবিক ভাষণ রাখেন বজরং দলের প্রমুখ কার্যকর্তা উত্তম চক্রবর্তীসহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কার্যকর্তা। এদিন স্থানীয় করসেবকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। শেষে অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত একটি ভিডিও প্রদর্শনী হয়।

মালদা গৈরিক পতাকায় ছয়লাপ

শঙ্খধ্বনিতে পথসঞ্চলনকে স্বাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২৩ ডিসেম্বর সকালে মালদায় পৌঁছেই টের পাওয়া গেল এবার আর এস এস-এর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভা বেশ ভালোই হবে। স্থানে স্থানে রাস্তার উপর স্বাগত তোরণ, অবশ্যই গেরুয়া কাপড়ে। কোনওটা লাগিয়েছে সরস্বতী শিশু মন্দির, কোনওটা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, আবার কোনওটা বা ভারতীয় জনতা পার্টির। বোঝা গেল পরদিন সঙ্ঘপ্রধান সুদর্শনজীর সভা সফল করতে সঙ্ঘপরিবার বলে আমজনতার কাছে প্রচলিত ও পরিচিত সবাই কোমর কষে ময়দানে নেমে পড়েছে।

মালদা শহরের কোনও রাস্তা আর বাকী নেই। সর্বত্র গৈরিক পতাকায় ছয়লাপ। তারপরেও নেতাজী সুভাষ রোডের আর এস এস কার্যালয়ে কর্মব্যস্ত একঝাঁক যুবক ও বালক স্বয়ংসেবক। ২৩ রাত্রেই কার্যকর্তা বৈঠকের স্থান ডি এস এ ময়দান লাগোয়া ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেখলাম টিপটপ্ ব্যবস্থা। রাত্রেই ভোজন বিভাগ নিকটবর্তী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয় থেকে উঠে এসেছে স্টেডিয়ামের বাইরের আঙিনায়।

সব দেখেশুনে বোঝাই যাচ্ছিল যে প্রায় ১৯ বছর পরে সরসঙ্ঘচালক আসছেন মালদা শহরে। ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস এসেছিলেন। তারপর উত্তরবঙ্গে সরসঙ্ঘচালকের ভ্রমণে অনুষ্ঠান হয়েছিল রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়িতে।

২৪ ডিসেম্বর ভোরে কলকাতা থেকে গৌড় এক্সপ্রেসে মালদা পৌঁছান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আপ্ত সহায়ক শ্রীরঙ্গমজী, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, সহ-ক্ষেত্র প্রচারক অজিত মহাপাত্র এবং ক্ষেত্রীয় প্রচার প্রমুখ ও প্রবীণ সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র। তাঁদেরকে মালদা টাউন স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী কুমার সরকার, প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং অন্যরা।

সুদর্শনজী নিবাস স্থানে পৌঁছেই সকালেই মাঠ পরিদর্শন করতে চলে যান। সে এক দৃশ্য। ওনি রীতিমতো প্রাতর্ভ্রমণ করলেন—পুরো মাঠ চার চক্কর দিলেন। সঙ্গে একদল স্বয়ংসেবক ও নিরাপত্তারক্ষী।

বিকেলের জনসভায় টানা বাংলাতে ভাষণ দিলেন সুদর্শনজী।

পূর্ব যোজনা মতো দুপুর ১টায় একত্রিত হয়ে সঙ্ঘের নিজস্ব বেশ পরিহিত স্বয়ংসেবকদের দুটো পথসঞ্চলন দুদিকে সঙ্ঘের ঘোষবাদ্য সহ বের হল। নির্দ্ধারিত সময়ে ফোয়ারা মোড়ে দুটি সঞ্চলন এক হয়ে ডি এস এ ময়দানে এসে শেষ হয়। ফোয়ারা মোড়ে একটি ছোট মঞ্চে বসেছিলেন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী এবং প্রান্ত সঙ্ঘচালক হেমন্তকুমার বর্মা। পুরো রাস্তায় স্থানে স্থানে মা-বোনেরা শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণের মাধ্যমে স্বাগত জানান। ফোয়ারা মোড়ে ব্যানার সহ শতাধিক রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকারা শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করে স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ বর্ধন করেন।

পথ সঞ্চলনে প্রথা বহির্ভূতভাবে উৎসাহের আতিশয্যও চোখে পড়ল। সবার শেষে একটা ট্যাবলো। তাতে দুজন শিশু বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার বেশে সজ্জিত। তাদের পিছনে কয়েকশ যুবক ভারতমাতা কী জয়, জয় জয় মাতা ভারতমাতা, রুদ্র দেবতা জয়জয় কালী বলতে বলতে চলেছে, উৎসাহে ভরপুর যৌবন জলতরঙ্গ। এবারে কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক কথাবার্তা ছাড়াও আরও দুটি বিষয় উল্লেখ না করলে বিবরণ অপূর্ণ থেকে যাবে। তা হল, ছাপান্ন জন পুরাতন স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে সুদর্শনজীর একান্ত বৈঠক, আলাপচারিতা ও পরিচয়।

২৬ ডিসেম্বর বিকেল তিনটায় ছিল কলেজ ছাত্র সম্মেলন। প্রায় সাতশ' জন কলেজ ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে সুদর্শনজী বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেন।

তিন শতাধিক কার্যকর্তার বৈঠক হল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে রাত্রে রুটি খেতে গিয়ে টের পেলাম — রুটি রন্ধনশালায়

(এরপর ১৪ পাতায়)

দক্ষিণবঙ্গে সঙ্ঘের নতুন প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবার দক্ষিণবঙ্গের নতুন প্রান্ত সঙ্ঘচালক হিসাবে নির্বাচিত হলেন অতুল কুমার বিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৭০ সাল থেকে তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। মূল স্বয়ংসেবক নদীয়া জেলার বামনপুকুর শাখার। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব, যথা নদীয়া জেলা শারীরিক প্রমুখ, অখণ্ড ২৪ পরগণা বিভাগ কার্যবাহ এবং সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর প্রান্ত সঙ্ঘচালক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সেই সূত্রেই তিনি এবার এই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং সেইসঙ্গে নতুন প্রান্ত কার্যকরী মণ্ডল গঠন করেছেন। এই মণ্ডলীতে রয়েছেন —

প্রান্ত সঙ্ঘচালক — অতুল কুমার বিশ্বাস, প্রান্ত কার্যবাহ - ডঃ তিলক রঞ্জন বেরা, প্রান্ত সহ-কার্যবাহ-প্রদ্যুৎ মৈত্র, প্রান্ত প্রচারক - রমাপদ পাল, শারীরিক প্রমুখ-শ্রীমন্ত চন্দ্র, সহ শারীরিক প্রমুখ-পঙ্কজ কুমার মণ্ডল, ব্যবস্থা প্রমুখ-হনুমান মল বোড়ার, সহ ব্যবস্থা প্রমুখ - কল্যাণ সাহা এবং শিবকুমার বাগলা, বৌদ্ধিক-অরবিন্দ দাশ, সেবা-সনৎকুমার বসু মল্লিক, সহ সেবা প্রমুখ-মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ আঢ্য, সম্পর্কপ্রমুখ-বীরেন পাল, সহ সম্পর্ক প্রমুখ- সুনীল ঘোষ, প্রচার প্রমুখ-সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রচারক প্রমুখ-প্রদীপ দে, কার্যালয়-প্রমুখ-অশোক সাহা, সহ কার্যালয় প্রমুখ-সুকেশ মণ্ডল, সদস্য-সুশীল রায় এবং নারায়ণ চন্দ্র পাল।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগ (দঃবঙ্গ) প্রমুখ— অবনীভূষণ মন্ডল।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগ (দঃবঙ্গ) সহ প্রমুখ— সনাতন মাহাতো।

গ্রাম বিকাশ প্রমুখ— শঙ্কর মিত্র।

প্রদেশ ঘোষ প্রমুখ— সুনীল সিংহ, সহঘোষ প্রমুখ স্বপন ঘোষ।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি

(৩ পাতার পর)

চাইলেন বাদশাহী আইন যেভাবে মোল্লা-মৌলবীদের উপর চলে না, ঠিক তেমনি বাদশাহী আইন যেন হিন্দু সাধু-সন্নাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। এবার সম্মত হলেন সম্রাট। সন্ন্যাসীদের আখড়া প্রস্তুত হল। সৃষ্ট হল নাগা সাধু সম্প্রদায়। এরা যেখানই মোল্লা-মৌলবীদের অপকর্মের সংবাদ পেতেন সেখানেই তাঁরা তাঁদের ত্রিশূল, কৃপাণ দিয়ে প্রতিহত করতে লাগলেন। বন্ধ হয়ে গেল জল মুখে ঢেলে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা। এ জন্য নাগা সন্ন্যাসীরা সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও শিরোমণি হয়ে আছেন। হিন্দু ধর্মসভায় মিছিলে স্নান এদের স্থানে সর্বাগ্রে। এরা না থাকলে ভারতবর্ষে কতজন হিন্দু বর্তমানে থাকতেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আবারও যখন ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করল তখন তাদের সঙ্গে এল খৃস্টান পাদ্রীরা। এরা খৃস্টধর্মে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মান্তরিত করতে চাইলেন। আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস,স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী। পিছু হটলেন পাদ্রীরা। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিজয়ের পর এরা হতোদ্যম হলেন। সম্মুখ বিতর্কে জয়ী হতে না পেরে এরা দরিদ্র, অশিক্ষিত, পাহাড়ি লোকদের মাঝে গিয়ে প্রচার চালাতে লাগলেন। বর্তমানে ক্লীব ভারত সরকারকে পেয়ে এরা যা খুশী তাই করছেন, যেটা তারা বৃটিশ শাসনেও করতে সাহস করেননি।

শুরু হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে গঠিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ইংরাজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি-তে ১৯০৫ সালে গঠিত হল মুসলিম লিগ। তার কিছুদিনের মধ্যেই কট্টরপন্থী হিন্দুরা গঠন করলেন হিন্দু মহাসভা। ভারতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে লাগল। মুসলিমরা এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিচ্ছেন না বলে তোষণ নীতির পথ ধরলেন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৯২১ সালে মুসলিমদের ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলনকে সরাসরি সমর্থন করে বসলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ১৯২৪ সালে মওলানা হসরৎ মোহানী অন্যান্য মোল্লা-মৌলবীদের সমর্থনে মুসলমানদের জন্য এক পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করলেন। দেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিমদের এসব আচার-আচরণ লক্ষ্য করে এরপর দীর্ঘ ছয় মাস ইসলামি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তারপর লালা লাজপত রায়কে চিঠিতে লিখলেন — 'আমার মনে হয় হিন্দু মুসলমান একতা সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিকও নয়।' ঠিক একই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বললেন — 'হিন্দুদের মধ্যে যদি ভীরুতা ও দুর্বলতা না থাকত, তা হলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক দাঙ্গা এড়ানো যেত।' এর কিছুদিন পরই ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন ডাঃ হেডগেওয়ার গঠন করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘে থেকে যারা পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করতে লাগলেন তারাও একরকম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

ডাঃ হেডগেওয়ারের পর যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনিও ছিলেন এক মহা সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। গোলওয়ালকর যাতে হিমালয়ে গিয়ে পুরোপুরিভাবে সাধনায় মগ্ন না হন তার জন্য গুরুর নির্দেশে তাঁর উপর নজর রেখে চললেন রামকৃষ্ণ মিশনের আরেক সন্ন্যাসী স্বামী অমূর্তানন্দ। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত গোলওয়ালকর তাঁর দায়িত্ব নির্বাহ করে গেলেনে। এ কথা অনস্বীকার্য যে আড়াল থেকে তাঁর অবদানের জন্যই ভারতবর্ষ তার বর্তমান মানচিত্র বজায় রাখতে পেরেছে নতুবা ভারতের মানচিত্র অন্য রকম হত। গোলওয়ালকরের ভূত-ভবিষ্যৎ জানার শক্তি কতটা ছিল তা বুঝা যায় ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন তাঁকে তাসখন্দ যাবার আগে ফোন করেন এবং গোলওয়ালকর তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন। অনেকে বলেন, ঋষি অরবিন্দের কঠোর সাধনার জন্যই ভারতবর্ষ এত সহজে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিগত পনেরো বছর ধরে দেশে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে মুসলিম আতঙ্কবাদীরা। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে ওইসব ঘটনায়। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতো নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছেন আমাদের সরকার। অন্ধ রাজার পুত্রস্নেহের মতো বিষম স্নেহ এখন অনেক রাজনৈতিক দলেরই ভোটব্যাঙ্ক। এমনকী বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সংসদ ভবন হামলাকারীকে ফাঁসি দিতে ভয় পাচ্ছে আমাদের সরকার। এমতাবস্থায় ইতিহাসকে আবার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। আবারও এগিয়ে এসেছেন দলে দলে সর্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরা। হয়তো পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় আবার এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে।

আমেরিকা থেকে এক চিঠেতে লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ — 'সমগ্র জগত জ্ঞানালোক চাইছে, উৎসুক নয়নও তার জন্য আমাদরে দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে, ইন্দ্রজাল, মূকাভিনয় বা বুজরুকিতে নয় আছে প্রকৃত ধর্মের মর্ম কথায়, উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগতে সেই শিক্ষার ভাগী করার জন্যই প্রভু জাতিটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে'।

সুকৃতের কৃতিত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সোমদেব দেব বর্মনের পর ভারতীয় টেনিসে আবার এক বঙ্গ সন্তানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বছর ১৪-র সুকৃত গুহ অবশ্য টেনিসের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাতেও সমান চৌখশ। লেখাপড়াটাও করে মন দিয়ে। স্কুলে প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ডও করে। তবে সব কিছুর মধ্যেও তার ধ্যান-জ্ঞান টেনিস। লক্ষ্য ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে আর বছর কয়েকের মধ্যে স্থান সুনিশ্চিত করা এবং পেশাদার সার্কিটে নিজের যাত্রাপথকে মসৃণ করে এগিয়ে যাওয়া। আর এই দুটি কাজ করতে গিয়ে হর্ষমানকান্দ, বিশাল উপ্পল, আসিফ ইসমাইলদের মতো লক্ষ্যও কক্ষের যথার্থ প্রাচুর্য রক্ষা করতে না পেরে যাতে অচিরে হারিয়ে না যান, সে বোধটুকুও ধরে রাখা।

শিক্ষিত পরিবারের সন্তান বলেই সুকৃত টেনিস ও স্কুল কলেজের লেখা পড়ার মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে চলতে চান। এই বয়সেই বুঝে গেছেপ্রথাগত শিক্ষা তার টেনিস কেরিয়ারকেই সমৃদ্ধ করবে। তাই দেশ জুড়ে সারা বছর সাব জুনিয়র র‍্যাঙ্কিং ও চ্যালেঞ্জার টুর্ণামেন্ট খেলার মধ্যেও সময় পেলে স্কুলের

সুকৃত গুহ

পড়া চালিয়ে যান ও পরীক্ষায় বসে প্রথম তিনে থাকেন। এই বয়সে বাংলার এক নম্বর সাব জুনিয়র খেলোয়াড়। গোটা দেশের মধ্যে সব বয়স স্তর মিলিয়ে ৫৭ তম। ছয় বছর বয়সে নেহাতই শখ করে টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়েছিল সুকৃত। বাবাকে সাউথক্লাবে খেলতে দেখে এই শখ জাগে ও বাবাই তাকে উৎসাহ দিয়ে সাউথক্লাবে ভর্তি করে দেন। এর তিন বছরের মধ্যে বাবা ও ছেলে দু'জনেই বুঝে যান টেনিসই একমাত্র ভবিতব্য।

পরিবার ও স্কুল থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা পাচ্ছে সুকৃত। তার সুফলও ফলতে শুরু করেছে। রজার ফেডেরারের ভক্ত সুকৃত বিটিএর 'অনূর্ধ ১২' চাম্পিয়ন হয়েছে বার দুয়েক। সারা ভারতভিত্তিক 'ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয়েছে জামসেদপুরে। এরপর কলকাতা ও জামসেদপুরে দুটি বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার সুবাদে মিডিয়ার নজরে চলে আসে সুকৃত। দেশে প্রায় সমস্ত 'অনূর্ধ ১৪' টুর্ণামেন্ট খেলা হয়ে গেছেতার। এখন একমাত্র লক্ষ্য বিদেশে গিয়ে খেলে পরিমার্জিত হওয়া।

শব্দরূপ - ৪৯২

রাণু দাশগুপ্ত

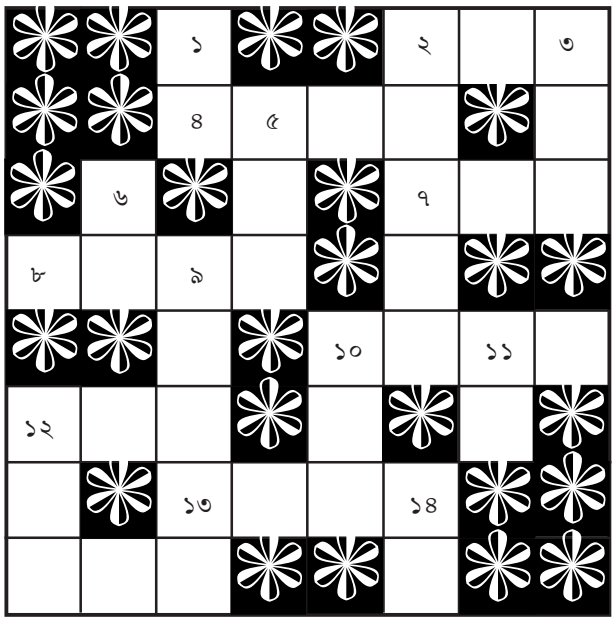

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. বিশেষণে যাতে কাঁটা আছে এমন, ৪. একই শব্দে চন্দ্র আর শিব, প্রথম দুয়ে কদলি, আগাগোড়া খাজনা, ৭. ওড়িশার একটি শহর, ৮. দেহের দুটি অঙ্গ, একে-তিনে সোনা, ১০. লিপিকর, একে-তিনে অল্প, ১২. বিশেষণে দরিদ্র, ১৩. তৎসম শব্দে চিঁড়ে, শেষ দুয়ে অম্ল, ১৫. দিনের প্রথম বিক্রয়,

উপর-নীচ ঃ ১. বায়স, ২. পদ্মের ন্যায় হাত, দুয়ে-চারে স্বামী, তিনে-পাঁচে যন্ত্র, ৩. মহাভারতে বিরাট রাজার শ্যালক, শেষ দুয়ে খড়ি, ৫. বিলিতি সিংহ, ৬. ইঙ্গ শব্দে লাথি মারা, ৯. গোলমরিচের মতো ঔষধে ব্যবহৃত ফলবিশেষ, শেষ দুয়ে শর্করা, ১০. দরজার পাল্লা, ১১. তৎসম শব্দে মাছি, ১২. গর্ব-র কোমল রূপ, ১৪. কুঁড়ি।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯০

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬

■	■	শি	ব	বা	হ	ন	■
■	■	রা	■	■	■	খ	■
ক্রু	মে	■	স	র	গ	র	ম
■	সো	পা	ন	■	ন্ধ	■	■
■	■	দ	■	ব	র্ব	র	■
বে	লে	পা	থ	র	■	ই	লা
■	খি	■	■	ব	■	■	■
■	কা	ব্য	না	টি	কা	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়।

২০০৮

ক্রীড়া সংস্কৃতির সালতামামি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ২০০৮-এ ভারতবর্ষের ক্রীড়াসংস্কৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব অলিম্পিক থেকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইভেন্টে ভারত ও ভারতীয়দের উজ্জ্বল ভূমিকা দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। জীবনের চেয়েও বড় খেলা ও শরীরচর্চা ভারতবর্ষকে বিশ্বজনমানসে

চিরস্থায়ী আসন করে দিতে চলেছে। যে কারণে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় আমেরিকা, ইউরোপসহ এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়াকে— সেই খেলার মাঠে সাফল্য কী বস্তু, তা বুঝতে পেরেছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা ও সরকার।

যে কারণে বিশ্বের অন্যতম ধনী শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল ভারতবর্ষের ক্রীড়া উন্নয়ণকল্পে ৫০০০ কোটি টাকার এক ফাউন্ডেশন গড়েছেন। লক্ষ্য বিভিন্ন খেলা ও শরীরচর্চার ইভেন্টে কয়েকশো কৃতি, উদীয়মান অ্যাথলিট বা ক্রীড়াবিদকে সারা জীবনের জন্য ভরনপোষণ দেওয়া ও তাদের বিশ্বমঞ্চে র জন্য উপযুক্ত করে গড়েপিঠে নেওয়া। তাদের মাসে দশ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ডও দেওয়া হয়। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো, বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন, বিদেশে নিয়মিত উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও টুর্ণামেন্ট খেলতে পাঠানো এই ফাউন্ডেশনের প্রধান সামাজিক দায়বদ্ধ তা।

খেলার জগৎ

সরকারও ক্রীড়া খাতে বাজেট অনেক বাড়িয়েছে। বিভিন্ন রকম উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা ও সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রক এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। দেশের সংবাদ মাধ্যমও যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে সব খেলাকে। অবশ্য বাঙলা পত্র-পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল-এর ব্যতিক্রম। ঠিকমতো প্রচার পেলে কত প্রসার হত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের, চিন্তা ও কর্মের তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ অভিনব বিন্দ্রা, বিশ্বনাথন আনন্দ, জীব মিলখা সিংহসহ ভারতীয় শুটিং, দাবা, গলফ। এই তিনটি খেলায় ভারত আজ বিশ্বপর্যায়ের বড় শক্তি। বিন্দ্রা হয়তো অলিম্পিক সোনা জয়ী, ভি সি আনন্দ তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু এদের বাদ দিলেও আরও বেশ কয়েকজন শুটার ও দাবাড়ু বিশ্বের এলিট গোত্রভুক্ত।

২০০৮-এ ভারত প্রথম ব্যক্তিগত স্তরে অলিম্পিকে সোনাজয়ী হল বিন্দ্রার মাধ্যমে। আনন্দ আজ মহাকিংবদন্তী ববি ফিশার ও গ্যারি কাসপারভের সমগোত্রীয়। জীব মিলখা মহার্ঘ যুক্তরাষ্ট্র পি জি এ ট্যুরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এ বছরে চারটি মান্টার্ণ টুর্ণামেন্ট জিতেছেন। হয়েছেন এশিয়ান অর্ডার অব মেরিট। আর হায়দ্রাবাদী তনয়া সাধনা নেহওয়াল ব্যাডমিন্টনে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর প্রতিবেশী সানিয়া মির্জা তেমন কিছু না করেই সারা বছর খবরের শিরোনামে থাকেন। আর সাইনী সিঙ্গাপুর ওপেন, জাপান ওপেন জেতেন, অলিম্পিক ও ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স সুপার সিরিজে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল পর্যন্ত ওঠেন এবং প্রত্যাশিত গ্লামার, যশ, অর্থ পান না। তবে এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিন্তা-ভাবনায় সার্বিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী না হলে মিত্তল, টাটা, হিন্দুজা গোষ্ঠীর মতো বড় বড় শিল্পসংস্থা ক্রিকেট ব্যতীত অন্য সব খেলায় অর্থ ঢালছেন কেন, অ্যাকাডেমি বা ফাউন্ডেশনও গড়ছেন কেন? এসবই ২০১০-র কমন ওয়েলথ গেমস বা দু বছর পরের লন্ডন অলিম্পিয়াডের জন্য।

মালদা গৈরিক পতাকায় ছয়লাপ

(১৩ পাতার পর)

তৈরি হয়নি। সব রুটি এসেছে স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি থেকে। তাও আবার শীতের রাত্রে সবাই খেয়ে শেষ করতে পারেনি। তাই দিয়ে পরদিন সকালে আবার জলযোগ করতে হল।

অবাক লাগছিল দূর-দূরান্ত থেকে মা-বোনেরা বাস ভাড়া করে এসেছেন দেখে। ফেরার সময় একজন দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করলাম — কে কে এসেছেন? উনি বললেন—সঙ্গে দুই নাবালক ছেলে। একজন দ্বিতীয় ও অন্যজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ি সুদূর কালিয়াগঞ্জে। বড়ছেলের নাম অমরনাথ মণ্ডল। অনেকদিন পরে এই অমরই বড় হয়ে একদিন বলবে, আমি তো সুদর্শনজীকে দেখেছি, ভাষণ শুনেছি। কেননা, ওর মা বললেন, ছেলে বায়না করছিল ড্রেস কিনে দিতে (সঙ্ঘের গণবেশ)। মায়ের ইচ্ছা সামনের বছর পঞ্চ ম শ্রেণীতে উঠলে ড্রেস কিনে দেবেন। এই নতুন ড্রেস কি ভারতবর্ষের নবোত্থানের ইঙ্গিত?

একলব্য ক্রীড়া ঘিরে জমজমাট শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শিলিগুড়ি সাইকেন্দ্রের সহযোগিতায় ১৩, ১৪ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর শিলিগুড়ির প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত খড়িবাড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত হল পূর্বাঞ্চ ল কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গীয় প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে পাশ্ববর্তী নকশাল-বাড়িসহ শিলিগুড়ির অধিকাংশ অঞ্চ লে যথেষ্ট সাড়া পড়েছিল। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রতিটি ব্লক মিলিয়ে প্রায় ৪১টি স্থানে, দু'হাজার ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণের পর মূলপর্বের অর্থাৎ প্রান্তস্তরের প্রতিযোগিতা হয় খড়িবাড়িতে। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্রকল্প রয়েছে এই খড়িবাড়িতে।

চূড়ান্ত অ্যাথলেটিক্সের ১০০, ২০০, ৪০০ মিটার দৌড়, তিরন্দাজি ও কবাডি এই তিনটি ইভেন্টে প্রায় দুইশত ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ছিল ১০৬ জন পুরুষ। বাদবাকিরা মহিলা ক্রীড়াবিদ। সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র স্তরে প্রতিযোগিতায় পাহাড় ও সমতলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তিরন্দাজির প্রতিটি বিভাগে কালিমপং ও দার্জিলিংয়ের ছেলে-মেয়েদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি সমতলের তিরন্দাজরা। অন্যদিকে অ্যাথলেটিসে উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ি ও মহিলা বিভাগে জলপাইগুড়ি চাম্পিয়ন হয়েছে।

কলকাতা থেকে এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রাক্তন ভারতীয় কবাডি দলনায়ক বিশ্বজিৎ পালিতকে খড়িবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কল্যাণ আশ্রমের ক্রীড়া প্রকল্প ও প্রতিযোগিতার গুরুত্ব তথা সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংগঠক শক্তিপদ ঠাকুর।

অন্যান্য অতিথি ও বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বভারতীয় শ্রদ্ধাজাগরণ প্রমুখ সুরেশ কূলকার্ণি, জনজাতি নেতা লক্ষ্মীরাম টুডু।

শিল্প নিয়ে অন্ধই এখন অন্ধদের পথ দেখায়

বিশাখা বিশ্বাস

'যুবক-যুবতীরা শক্ত দুটি হাতে কাজ চায়, কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, বেকারির যন্ত্রণায় ভুগছে।'...

না। মনোমুগ্ধকর সেই ভাষণের ইতি এখানেই নয়। বক্তব্য — শেষের সেই কথাগুলি আরও মনোহর — জনসমাবেশের শিল্পীতের সরোবরে শতদল সজ্জিত মঞ্চ হতে 'শিল্প শিল্প' করে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চান সেই মরূদ্যানের 'নাটুকে নটবর'। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বেকার যুবসমাজের বুকে নতুন আশার নাড়ানি-ঝাঁকানি দিয়ে শিল্পস্বপ্নে নীল চোখ দুটিকে কালো চশমায় ঢেকে, শুভ্র বেশ শুভ্র কেশ বঙ্গরাজনীতির 'উন্নয়নেশ্বর উত্তমকুমার'টি তাঁর বক্তৃতা শেষ করছেন ঃ কাজ, কাজ! শিল্প, শিল্প, শিল্প চাই! নির্বোধ বিরোধীদের জিজ্ঞেস করুন, টাটাদের ডেকে এনে কি ভুল করেছিলাম? — মঞ্চের সম্মুখে বসা গাঁ-গঞ্জ থেকে ডাকিয়ে আনা তাড়িয়ে আনা ক্যাডার — সমর্থকগণের কণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিবাদী ভাষা তার সেই জিজ্ঞাসার জবাবে 'নটবরের' প্রাণের তারে তারে ঝঙ্কার তুলে যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো ঃ না, না, না।...

না, নটবর 'ভুল' করেননি। কেননা পুরনো অপ্রাসঙ্গিক চিঠি পড়ার মতো সজল কৌতুকে এখন আর আমরা পড়তে পারি না কার্লের 'ক্যাপিট্যাল'—এখন লেনিনেরাও মরে গেছেন, দুঃসময়ের মেঘের মধ্যে রঙিন আলোয় ভোগের পথ বেয়ে গিয়ে আমাদের এখন স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে পুঁজিপতিদের পেলব পা। তাই, যে মোটরগাড়ি শিল্পকে ঘিরে বিশ্বে সর্বপ্রথম চালু হয়েছিল সেই 'জবলেস্ গ্রোথ' বা কর্মসংস্থানহীন উন্নয়নের পরিহাস, যে অটোমোবাইল শিল্পের বিপর্যয়ে খোদ আমেরিকায় কর্মহীন হয়ে গেল পঁয়ত্রিশ লক্ষ কর্মচারী এবং সহায়কী বৃত্তিবদ্ধ, মানুষ নটবরের স্বপ্নের 'শিল্পের সবুজবন' সেই সিঙ্গুরে (বারো হাজার মালিক ৭ এগারো হাজার বর্গাদার ৭ দশ হাজার ক্ষেত-মজুর ৭ প্রায় পাঁচ হাজার উৎপন্ন ফসল কেনা-বেচার দালাল ৭ ফড়ে ব্যবসাদার ঞ্ঞ ৩৮ হাজার মানুষের পেটে লাথি মেরে কেবল বেকারের কাজ ও শিল্পের জন্যে তাই কাঁদে আনন্দবাজার, কাঁদেন নটবর, কাঁদেন সেন (শর্মা) — সেইসব কোঁদন ও ক্রন্দনের খবর নিয়ে চব্বিশ প্রহর ধরে রাজার ঘন্টা-মিডিয়া দিচ্ছে হানা খোদ বাংলা থেকে বর্মা (রবীন্দ্রনাথ, খোদ বিশ্বভারতীকেই তো নিয়ে গেছে চোরে, তোমার কথা চুরির এই অপরাধ ক্ষমা করে দিয় গুরুদেব)।...

যখন শিল্প জোয়ারে রাজ্যের ছাপ্পান্ন হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, নানান কলকারখানায় একুশ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে, চালু হিন্দ্ মোটরস্ আর ডানলপ উঠে যেতে বসেছে, চটকলে-চা-বাগানে-তাঁতশিল্পে-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রতিদিন ছাঁটাই চলেছে, বেপরোয়াভাবে সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে মালিকরা শ্রমিকেরা পি-এফ-গ্র্যাচুইটির টাকা মেরে দিচ্ছে — সে সব দিকে চোখ বুজে থেকে, ঠিক তখনই জনগণের টাকায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রায় বিনাপয়সায় জমি দান করে, পনেরো পার্সেন্ট সুদে ব্যাঙ্কের টাকা ধার করে দুই'শ কোটি টাকা মাত্র শূন্য দশমিক এক টাকা হারে সুদে ঋণ দিয়ে আটত্রিশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নিয়ে সর্বসাকুল্যে রাজ্যের এবং রাজ্যান্তরে বড়জোর দক্ষ-অদক্ষ বারো হাজার বেকারের কাজের সংস্থান ঘটাতে 'গরীব পুঁজিপতি' রতন টাটার পা ধুইয়ে দেবার রাজসূয় যজ্ঞ করে 'ভুল' আমরা করিনি। 'আলু আর শসার চাষে মমতার ভবিষ্যৎ আটকে' গেলেও যদি কেউ তার ভুলের প্রশ্ন না তোলে, তো, 'কাজ কাজ আর কাজের' জন্যে টাটা-সালিমদের চরণসেবার বৃত্তিতে যদি নিবদ্ধই হয়ে যায় আমাদের চোখ—তো, ভুল কোথায়?

'ভুল'-ই যদি হতো, তাহলে, অবৈধ আফিম ব্যবসায়ে চীন থেকে যে টাটা-মনিবদের পুঁজি ফেঁপে উঠেছে, জামসেদপুরের দরিদ্র আদিবাসীদের শোষণে-নিষ্পেষণে যে টাটাপ্রভুদের পুঁজি পৃথিবীর বুকে পক্ষবিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, ওড়িশায় অনাহারী অর্ধাহারী আদিবাসীগণের ওপর যে টাটাবাবুরা স্বয়ং গুন্ডাগিরি করে এসেছে, সর্বোপরি যে টাটারা তাদের খোদ জামসেদপুরের কারখানায় শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা পঁচাশি হাজার থেকে আটত্রিশ হাজারে নামিয়ে এনেছে, টেলকো-তো সেই সংখ্যা বাইশ হাজার থেকে মাত্র ছয় হাজারে কমিয়ে এনেছে, পুণেতে গাড়ি কারখানায় সেই সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে ঊনিশ হাজারে হ্রাস করে ফেলেছে—সেই টাটা কী আমাদের 'লার্জার দ্যান লাইফ' (নিজের চেয়েও যার আদর্শ বড়) নামক আনন্দবাজার প্রচারিত উপমায় উপমিত লালবাংলার 'উন্নয়নেশ্বর'টিকে শিল্পবান্ধব বলে ভোটের আগেই আনন্দবাজারে গীত গাইতো? ভুলই যদি হতো, তাহলে, অমাদের বেকারত্বের বঙ্গীয় 'কালহারিতে' কল্পকাব্যের প্রেয়সীর মতো এই অটো-মোবাইল শিল্পশ্রেয়সীর হাত ধরে মেরে ফেলা মার্ক্সবাদে দীক্ষিত মরমী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধিশ্বরটিকে টাটা-সালিম-জিন্দালদের মতো পুঁজিপতিরা কী এত তাড়াতাড়ি তাদের মনোবিতানে এমন করে ঠাঁই দিত? ভুল কী ভাই হয় — ভুল হলে কী পুঁজির পুষ্পোদ্যানে 'সোহাগীরা' এমন সোহাগ পায়?....

সোহাগীরা ভুল করতে পারে না। ছিয়াশি বছরের পুরনো পার্টি ভুল করতে পারে না, সোহাগীদের একত্রিশ বছরের পুরনো প্রশাসন ভুল করে না, করলেও দশ বছরের পুরনো না হলে ভুলের সেসব খবর বাংলার মানুষ খায় না। তাই, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। পুরনো মদ স্বাদে বাড়ে। তাই ত্রিশ বছর আগে আমরা যারা তাড়ি খেতাম, পনের বছর আগে তারা দেশি মদের স্বাদ নিতাম, এখন তারা একসাথে বসে 'ভিন্ তাজ ওয়াইন' খাই। তাই দিল্লীর পার্টি কংগ্রেসের যে দলিলে বিগত পাঁচ সালে আমরা বলেছিলাম ''বর্তমান কালের শিল্পবিকাশে মানুষ যে কেবল কর্মহীন হচ্ছে তাই নয়, সেই বিকাশে মানুষের কর্মচ্যুতিও ঘটছে(পৃ-৯)''—এখন চোখে উঠেছে কালো ঠুলি, মুখে ফুটেছে পুঁজির বুলি, এখন তাই সেসব কথা আর মনেও নাই। এখন আর মনেও পড়ে না আমাদের বঙ্গীয় বুদ্ধিশ্বরের চেয়েও অনেক বড় মাপের বুদ্ধিজীবী মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক প্রখ্যাত প্রভাত পট্টনায়কের সেই সতর্কবাণীটি ঃ এখন শিল্পায়নে মানুষ আর কাজ পায় না, কেননা কর্পোরেট শিল্পায়নে এখন আর কর্মসংস্থান হয় না (ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৬ মে-২০০৭)। ...

লজ্জা। বড় লজ্জার কথা 'শিল্পেশ্বর' গুণমণি, তোমার গুণের কথা কেউ না জানলেও আমি জানি। কাজ, শিল্প আর টাটাকে নিয়ে সিঙ্গুরের মাটিতে মূত্রে-বিষ্ঠায়-বমিতে মাখামাখি হবার পরেও শিল্পায়নে কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতার কথাটা তুমি না জানলেও জেনে গেছে অন্য কেউ — কেননা এখন শেঠ-ঘোষ-কোঙারেরাই তোমাকে রাস্তা দেখায় ঠিক যেমন করে অন্ধরাই অন্ধকে দেখায় পথ। সত্যের চোখে লাজ, মরি, হায় হায় রে।....

পাকিস্তানী শাসকরা কন্ডোলিজ রাইস অথবা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন যাঁর কাছে যেকথাই বলুক না কেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যতই নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক না কেন, পাকিস্তানে জমাত উদ্ দাওয়া বা লস্কর-এ-তৈবার সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়নি। বড় শহরে তাদের অফিসে তালা মারার দৃশ্যটা বৈদ্যুতিন মিডিয়া বা খবরের কাগজে লোক দেখানো। লাহোরের রাস্তায় রাস্তায় জমাত উদ্ দাওয়ার জন্য অর্থ বা তহবিল সংগ্রহে যে ভাঁটা পড়েনি, এই ছবিটাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পূর্বস্থলীর বিশাল হিন্দুসঙ্গমে হিন্দুদের জাগ্রত হওয়ার আহ্বান

অয়ন প্রামাণিক ।। গোটা দেশজুড়ে চলতে থাকা হিন্দু বিরোধী ষড়যন্ত্র ও তার নৃশংস পরিণতির মোকাবিলা একমাত্র জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজই করতে পারে — এই ধবনিতেই গমগম করছিল পূর্বস্থলীতে আয়োজিত ধর্মজাগরণ সমন্বয় সমিতির কানায় কানায় ভরা সারদা কুম্ভ। গত ২০ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গায় হিন্দুসঙ্গমে জনস্রোত প্রায় দশ হাজার ছাড়ায়। এইদিন সকাল থেকে যজ্ঞাগ্নির তেজ বিকালের সভাতেও সমান তালে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিন্দু সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাদেশিক প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণে হিন্দু বিরোধী চক্রান্তের নৃশংস পরিণতি ওড়িশায় লক্ষ্মণানন্দজীর হত্যার কথা উঠে আসে। প্রতিবাদ হিসেবে তিনি বলেন, প্রত্যেক হিন্দুকে শপথ নিতে হবে, যাতে দেশের কোনও গ্রামেই ধর্মান্তরকরণ তারা হতে দেবে না। একইভাবে জম্মু-কাশ্মীরে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের জমি হস্তান্তর নিয়ে ঘটে যাওয়া দীর্ঘ ৬৩দিনের অক্লান্ত আন্দোলনের কথাও এদিন বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ধর্মজাগরণ সমন্বয় সমিতির শক্তিশালী হিন্দু সমাজ সম্মেলন ছিল দেখার মতো। সভায় উপস্থিত প্রণবকন্যা সঙ্ঘের দেবদত্তা মাতাজী হিন্দু সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে বলেন,'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়'। সঙ্গে এও বলেন, হিন্দুদের ওপর চলতে থাকা মুম্বাই জঙ্গি হামলার মতো মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলকে সংগঠিত হতে হবে।

সভার শুরুর দিকে সাধিকা স্মৃতি পোদ্দার হিন্দু সংস্কৃতির সনাতন ঐতিহ্য ও ভাগবতের উপর আলোকপাত করে বলেন, ভাগবতের সব ধর্মের উপর জয়লাভ খুঁজে পাওয়া গেল — 'সমস্ত ধর্ম বলল বিশ্ববাসী তোমাদের ভয় নেই সারাদিন সাধনা কর .... আর ভাগবত বলল, ভাগবতের কথা শুনলেই মঙ্গল'। শুধু তাই নয়, তিনি জোরগলায় বলেন হিন্দু ধর্মের কোনও কথাই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। এ কথাগুলোর মধ্যে তিনি বুঝিয়ে দেন আজও হিন্দুরা জেগে উঠবে আপন বৈভবে। এই হিন্দু সমাবেশে আরও সঙ্গ দিয়েছিলেন প্রাণবকন্যা সঙেঘর ধাত্মানন্দাজী, স্বামী তিতিক্ষানন্দজী, স্বামী নিত্যচিত্তানন্দজী, পরাশর রামানুজ দাস, সোমনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ, আর এস এসের নদীয়া জেলা প্রচারক রবিকিঙ্কর ঘোষ এবং অবনীভূষণ মন্ডল। পরপর এই জাগরণের কথা চলতে থাকলেও সোমনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ অবশ্য তির্যকভাবে টনক নাড়ানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, যখন অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, আমাদের পুরাণে তখন নররূপী সিংহের আবির্ভাব হয়েছিল অশুভশক্তির দমনে। তাই আমাদেরও জানা আছে কোনও রোগের কীভাবে ওষুধ দিতে হবে।

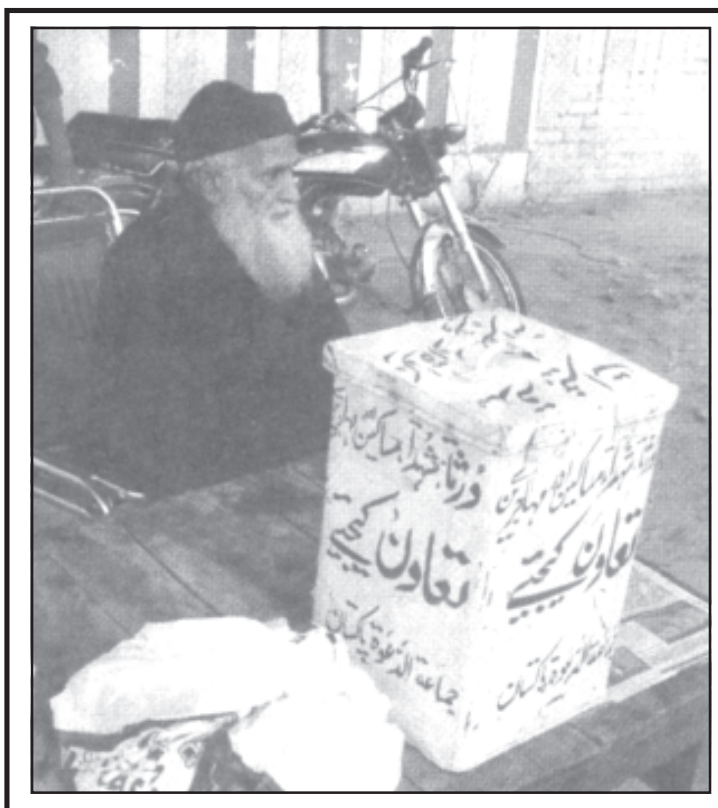

সব মিলিয়ে একদিন ব্যাপী এই বিশাল সারদাকুম্ভ জ্যান্ত হিন্দুদের 'জ্যান্ত দুর্গা'র আরাধনার রূপ নিয়েছিল।

ধর্মসভাতে বক্তব্য রাখছেন স্মৃতি পোদ্দার।

Swastika
5 January - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

মালদার ফোয়ারা মোড়ে দুটি পথসঞ্চলনের সম্মিলন। ছবি ঃ গৌতম বিশ্বাস

বাংলাতে একমাত্র স্বস্তিকা ঃ সুদর্শনজী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্থান-মালদা, তারিখ-২৫ ডিসেম্বর। উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তা বৈঠকে শ্রীসুদর্শনজী সব বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। খোঁজ নিলেন স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার নিয়েও। সব শুনে একটু জোরের সঙ্গেই প্রদেশের কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাধারণ বাজারী কাগজে তো সঙ্ঘ বিরোধী খবরই বের হয়। সারা দেশে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যে প্রতিক্রিয়া বিবৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয় তা তো বাংলাতে একমাত্র 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বস্তিকা তো ষাট বছরের বেশি সময় ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এরকম ধারাবাহিকতা তো কোনও পত্রিকার নেই। উত্তরবঙ্গে স্বস্তিকার প্রচারসংখ্যা কম করেও দশ/পনেরো হাজার হতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সরসঙ্ঘচালকজীর স্বস্তিকার ব্যাপারে এরকম আগ্রহে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের বেশ নাড়া দিয়েছে দেখা গেল।

মালদায় জনসমাবেশের একাংশ।

ডি এস এ ময়দানে স্বয়ংসেবকদের সমাবেশ। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

(৪ পাতার পর)

ভাগবত কথা জ্ঞান-যজ্ঞ কলকাতায় সম্পন্ন

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি (কলকাতা)-র সভাপতি সজ্জন কুমার বনসাল জানান, বনবাসী সমাজের অবস্থা সম্পর্কে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবগত করানোর জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। কথাকার যোজনা, শ্রীহরি রথ যোজনা, গ্রাম সমিতিসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প সমিতির আওতায় রয়েছে। সমাজের লোকেরা বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান দিয়ে চলছে। এই ধরনের সেবামূলক কাজের সাথে নতুন নতুন ব্যক্তিরা যুক্ত হচ্ছেন। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বনবাসী ক্ষেত্রের কাজ। শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির সম্পাদক সুভাষ মুরারকা বলেন, প্রাকৃতিকভাবে ভারতের সংস্কৃতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' প্রথায় বিশ্বাসী। ভারতের সংস্কৃতিতে সবাইকে একসাথে নিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। বিগত ১৩ বছর ধরে বনবাসী সমাজে শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। যার প্রভাব পড়েছে বনবাসী সমাজের ওপর। শ্রীমদ্ দেবী ভাগবত কথা জ্ঞান-যজ্ঞকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। শক্তিধাম ময়দানে কলকাতা পুলিশের সাথে সাথে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদেরও নিরাপত্তার দায়িত্বে দেখা গিয়েছে এদিন। শ্রীমদ ভাগবত কথা আয়োজন সমিতি (২০০৮)-র সভাপতি হয়েছেন শ্যামসুন্দর কেজরিওয়াল। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সুভাষ মুরারকা। অনুষ্ঠানের নিয়ম-নিষ্ঠা দেখে আপ্লুত ভক্তরা।

ভাগবৎ প্রবচনরত সন্তোষীমাতা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com